Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম বনাম ইসলাম-দ্বীনকে ব্যাক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইমাইয়া খাতুন ইমা

রোলঃ 23090121697

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম বনাম ইসলাম-দ্বীনকে ব্যাক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইমাইয়া খাতুন ইমা

রোলঃ 23090121697

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেকুলারিজম বনাম ইসলাম-দ্বীনকে ব্যাক্তিগত করে রাখার ফাঁদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইমাইয়া খাতুন ইমা, আইডিঃ 23090121697 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

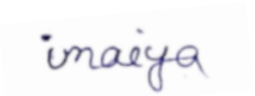
এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেকুলারিজম বনাম ইসলাম-দ্বীনকে ব্যাক্তিগত করে রাখার ফাঁদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

ইমাইয়া খাতুন ইমা

আইডিঃ 23090121697

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সেকুলারিজম কি এবং এর পরিচয়-.....7

পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি এবং সেকুলার চিন্তার উদ্ভব-.....9

১.স্বাধীনতা(Liberty).....11

২.সমতা(Equality).....16

৩.উন্নতি (Development).....19

সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) এর বিভিন্ন রূপ-.....26

ইসলামি নৈতিকতাবোধ বনাম পশ্চিমা লিবারেল–সেকুলার নৈতিকতার সংঘর্ষ 33

সেকুলার মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি কি কাফের গণ্য হবে?.....44

হিউম্যানিজম কী: এটি কি আদৌ নিরপেক্ষ হতে পারে? 51

পরিশিষ্ট - 61

প্রারম্ভিকা-

، بسم الله والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সাত আসমান ও জমিনের অধিপতি এবং সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সত্য ও সুস্পষ্ট মালিক। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সকল সাথীর উপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।
বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহ এক গভীর সংকট ও দুরবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। এক সময় যারা মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও আদর্শ জাতি হিসেবে পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিয়েছে, আজ তারা নানা কারণে অবহেলিত, দুর্বল ও নিপীড়িত। এর প্রধান কারণ হলো—নিজেদের দ্বীন থেকে বিচ্যুতি। যে দ্বীন আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য হিদায়াত ও পথপ্রদর্শক হিসেবে নাযিল করেছেন, সেই দ্বীনকেই আমরা জীবন থেকে পৃথক করে ফেলেছি।

প্রাথমিকভাবে এই বিচ্যুতি মুসলিম সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে তা গোটা উম্মাহর মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। এর ফলে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা মুসলিম সমাজে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার প্রতিটি স্তরে এই ধারণা ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে মুসলিমরা আজ এতটাই বিচ্যুত যে, হিদায়েত ও তাকওয়ার মূল উৎস দ্বীনের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার প্রয়োজন বোধ করছে না।

সেকুলারিজম একটি মতবাদ, যার মূল উদ্দেশ্য ইসলাম ও তার শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা সৃষ্টি করা। ইসলামী আইন, ইবাদত, লেনদেন ও নৈতিক আচরণ এই মতবাদের লক্ষ্যবস্তু। এই মতবাদের প্রধান লক্ষ্য হলো প্রবৃত্তি অনুসরণ এবং পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা। তাদের অন্যতম শ্লোগান হলো "রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক কর।" এই মতবাদ ও এর ধারকবাহকরা দ্বীনপ্রাণ মানুষদের রক্ষণশীল, প্রগতির অন্তরায় বা পশ্চাৎগামী হিসেবে চিহ্নিত করে, যা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ও বিভাজন সৃষ্টি করে।

সেকুলারিজম ধারণার শিকড় নিহিত রয়েছে পাশ্চাত্য ইতিহাসে। রেনেসাঁ (১৪৫৩-এর পরবর্তী সময়), রিফরমেশন আন্দোলন এবং মানববাদী দর্শন (Humanism) মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি, ব্যক্তিসত্তা ও যৌক্তিক চিন্তাকে কেন্দ্রস্থানে এনে দেয়। এই মানবকেন্দ্রিক ভাবধারার উত্থান,যেখানে মানুষকে সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় - পরবর্তীতে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি, সেকুলারিজমের দর্শন এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার গঠন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এসব ধারা একদিকে ধর্মকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করে, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সমাজকে ধর্মীয় মূল্যবোধহীন কাঠামোর দিকে পরিচালিত করে।

আজকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, প্রযুক্তিগত সাফল্য ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য অনেক মুসলমানকে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি অন্ধ অনুকরণে প্রবণ করে তুলেছে। তারা ইসলামের মূলনীতি ও সেকুলার স্লোগানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে।যার ফলাফল হচ্ছে আকীদাগত দুর্বলতা, দ্বীনি ধারণার বিকৃতি এবং ইসলামের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা উপেক্ষা করা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—যে জাতি নিজস্ব আকীদা ও সভ্যতাগত ভিত্তিকে পরিত্যাগ করে ভিন্ন দর্শনের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে, তাদের মধ্যে দ্বীন ও পরিচয়ের শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেকুলারিজমের ইতিহাস, প্রকৃতি, রূপভেদ ও মুসলিম সমাজে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীনকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করার এই প্রবণতার প্রতিকার উপস্থাপন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

সেকুলারিজম কি এবং এর পরিচয়-

Secularism(সেকুলারিজম) মূলত ইংরেজি শব্দ।আরবিতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে علمانية (আলমানিয়া) এবং বাংলায় একে অনুবাদ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা হিসেবে। শব্দটি যদিও ছোট ,কিন্তু এর তাৎপর্য খুব বড়, বিশেষত মুসলমানদের জন্য।প্রত্যেক মুসলামানদের এই বিষয়ে স্পষ্ট থাকা জরুরি।এবার আসি মূল আলোচনায়-

ইংরেজি অভিধানে secularism শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে:

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।

২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়।

৩. দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়[1]।

একই অভিধানে secularism শব্দের সংজ্ঞায় এসেছে:

"secularism এমন একটি দর্শন, যার বক্তব্য হচ্ছে, চরিত্র-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না"।

'ব্রিটিশ বিশ্বকোষ'-এ সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয়েছে: "সেকুলারিজম একটি সামাজিক আন্দোলন, যার একমাত্র লক্ষ্য মানুষদেরকে পরকালমুখী থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ামুখী করা"।

Encyclopedia Britanica নামীয় ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা 'নাস্তিকতা' শিরোনামের অধীন secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা (إلحاد نظري)

২. ব্যবহারিক নাস্তিকতা (إلحاد عملي)।

'বিশ্বকোষ' সেকুলারিজমকে দ্বিতীয় প্রকার নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত করেছে।[2]

[(1) 'দুনিয়াবিমুখিতা' বা 'সংসারবিরাগী' খৃস্ট ধর্মে একটি ইবাদতগত বিষয়। খৃস্টানগণ এ বিদ'আতটি আবিস্কার করেছে। সুতরাং যখন তারা বলে, সেক্যুলার অর্থ, 'সংসারবিরাগী নয়' তখন তারা এর দ্বারা অর্থ নেয় যে, সে ইবাদতকারী নয়। মুসলিমরা মনে করে যে সংসারবিরাগী হওয়া বিদ'আত। কিন্তু খৃস্টানরা এটাকে বিদ'আত মনে করে না। তারা এটাকে তাদের সত্যিকার দ্বীন মনে করে। সুতরাং যখন কেউ বলবে যে, অমুক সংসারবিরাগী নয় তখন সে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয় যে, লোকটি ইবাদতের ধার-ধারে না। 'বিদ'আত করে না' এ অর্থ উদ্দেশ্য নেয় না।

[2] নাস্তিকতার উপর আভিধানিক বিশ্লেষণ ড. মুহাম্মদ যায়ন আল-হাদি রচিতنشأة العلمانية বা 'সেকুলারিজম এর উৎপত্তি' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।]

-

বাংলা একাডেমির অভিধান (২০১২) অনুযায়ী Secular মানে পার্থিব, ইহজাগতিকতা,জড়,জাগতিক।

Secular State 'গীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র'। এ অর্থ অনুযায়ী মুসলিম দেশে এর ব্যাখ্যা হবে মসজিদের সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র।

Secularism মানে "নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়"—এই মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ।

এ অর্থগুলো লিখেছে বাংলা একাডেমীর অভিধান। এটির সম্পাদনায় কোনো ডানপন্থী বা কোনো 'হুজুর' জড়িত ছিলেন না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক।এমনকি উইকিপিডিয়ার ব্যাখ্যাতেও Secularism-কে Anti-Islam হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এআলোচনা থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হল:

এক.

সেকুলারিজম একটি কুফরি দর্শন, তার একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়াকে দ্বীনের প্রভাব মুক্ত করা। সেকুলারিজম একটি মতবাদ, তার কাজ হচ্ছে পার্থিব জগতের সকল বিষয়কে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিজের তৈরি বিধান দেওয়া ও সকল স্তরে নেতৃত্ব প্রদান করা।

দুই.

সেকুলারিজমের সাথে জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন কতক কুচক্রী মানুষদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য বলে, সেকুলারিজম অর্থ 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ ও তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা'। এ বক্তব্যের অসারতা ও সত্য গোপন করার অপকৌশল আমাদের বর্ণিত অর্থ থেকে স্পষ্ট, যা আমরা গ্রহণ করেছি 'সেকুলারিজম' এর সুতিকাগার থেকে, যে সমাজে তার জন্ম ও পরিচর্যা হয়েছে।তাই 'সেকুলারিজম' এর অর্থ যদি করা হয় ধর্মহীনতা, তাহলে তার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে এবং তাতে অপলাপের কিছু থাকবে না, বরং যথার্থ অর্থই স্পষ্ট হবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি এবং সেকুলার চিন্তার উদ্ভব-

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাগত ভিত্তি গড়ে ওঠে দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিবর্তনের মাধ্যমে। যুক্তিবাদের যুগে ইউরোপে দর্শনের দুই প্রধান উৎসের একজন ছিলো রেনে দেকার্ত— যে ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক, গণিতবিদ এবং একই সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক। দেকার্ত নিজের লেখনীতে মানুষের সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা চালায় এবং এভাবে সে খৃষ্ঠধর্মের সেবা করে।কিন্তু সেবার নামে সে করে ফেলে বিশাল ক্ষতি।পশ্চিমাদের মানসিকতা বিকৃত করার ক্ষেত্রে তার মতো দায়িত্বশীলতার পরিচয় হয়তো আর কেউ দেয় নি।তার ব্যাপারে একজন ফারাসি রোমান ক্যাথলিকের বক্তব্যই সেই বিকৃতির ভয়াবহতাকে প্রকাশ করে:

"ফ্রান্স খোদার সাথে সবচেয়ে বড় যে পাপ করেছে,তা হলো দেকার্তকে জন্ম দেওয়া।"

দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি “I think, therefore I am” —“আমি চিন্তা করতে পারি,এজন্যেই আমি 'আমি'। অর্থাৎ সে আসলে মানুষের পুরো সত্ত্বাকে যুক্তি বা বুদ্ধির উপর সীমাবদ্ধ করে দেয়। তার কথা ছিল—এখন থেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণের চূড়ান্ত মানদণ্ড হবে ‘আকল’। এই যুক্তিবাদ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ তাদের চিন্তা ও আচরণে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব দিতে শুরু করে সমাজকে। সমাজ যেটাকে গ্রহণ করবে, সেটাই সঠিক; সমাজ প্রত্যাখ্যান করলে তা বাতিল। ধীরে ধীরে সমাজকেই তারা সর্বোচ্চ নৈতিক অথরিটি বানিয়ে ফেলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যাত হয়। সমাজের পরিবর্তে তখন ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আগে ভালো-মন্দের নীতিনির্ধারক ছিল সমাজ। অর্থাৎ প্রভুত্বের অথরিটি ছিল সমাজের। পরবর্তীকালে এই অথরিটি দেওয়া হয় ব্যক্তিকে। অবশ্য ইউরোপের বাইরে মুসলিম দেশগুলোর অনেক জায়গায় ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের উক্ত অবস্থান এখনো রয়েছে। সমাজ কী বলবে! সমাজ ভালো বলবে না- এসব কথার আড়ালে এখনো অনেক ইসলামি বিধান প্রত্যাখ্যান করা হয়।

মোটকথা, ইউরোপ সত্য-মিথ্যা, নৈতিকতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সমাজকে সর্বোচ্চ অথরিটি দান করুক কিংবা ব্যক্তিকে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু একই মানববাদ। উভয় ক্ষেত্রেই তারা মানুষকে সর্বোচ্চ অথরিটি দিচ্ছে, রবের আসনে বসাচ্ছে। -(১)

-

[(১)তাআরুফে তাহজিবে মাগরিব-৮৯-৯০]

অন্যদিকে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সভ্যতা বলতে বোঝায় এমন একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো, যেখানে আকিদা, ঈমান, ইবাদত, সুন্নাহ ও মু'আমালাত মিলিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জীবনব্যবস্থা তৈরি করে। ইসলামি ইমারাহ প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই, যখন রাষ্ট্র ও সমাজ

উভয়ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম এবং রাসুলের সুন্নাহ কর্তৃত্বশীল অবস্থানে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা এ ধারণাকে উল্টে দিয়ে 'মানুষ'-কে কেন্দ্রে বসায়।

পশ্চিমাবিশ্ব এখন নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নেই। যেসব ভূখণ্ড পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদা মেনে নিয়েছে, সেগুলো পাশ্চাত্য বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে যেসব ব্যক্তি পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদাকে আদর্শিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, তারা পাশ্চাত্যের সদস্য হয়ে পড়েছে। প্রাচ্যে বসেও তারা পাশ্চাত্য। আর এ আকিদাগুলো না জানার কারণে মুসলিম সমাজ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে, অজান্তেই আপসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার সেকুলার ফাঁদে আটকে যাচ্ছে। আমাদের এই এপ্রোচ পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্য সর্বপ্রথম আমাদের পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদা স্পষ্টরূপে বুঝে নিতে হবে ইসলামের ট্রাডিশনাল অবস্থান থেকে। তারপর তাদের আকিদার উপর আঘাত জানতে হবে। কারণ সভ্যতার জয়-পরাজয় তার আদর্শ ও দর্শনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

গ্রিক-দর্শনসহ প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে যেসব সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে, মোটাদাগে সেগুলোকে তিন ভাগ করা যায়- ইন্দ্রিয়নির্ভর সভ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সভ্যতা এবং প্রত্যক্ষবাদী সভ্যতা। আবার এই তিন সভ্যতার দাফনস্থল থেকেই পশ্চিমা সভ্যতার জন্ম। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে যে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সৃষ্টি, এখন আমাদের সে দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ইতিহাসের নির্যাস থেকে যে বিষয়টা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তা হলো এই নতুন পশ্চিমা সভ্যতা মৌলিকভাবে তিনটি বিশ্বাস ও আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা প্রাচীন জাহেলি সভ্যতাগুলোরই ভিন্ন রূপমাত্র। সেগুলো হলো-

(১) স্বাধীনতা (Liberty)

(২) সমতা(Equality)

(৩) এবং উন্নতি বা প্রগতিবাদ (development)

এই তিনটি ধারণাই সেকুলার চিন্তা ও জীবনব্যবস্থার ভিত্তি নির্মাণ করেছে—যেখানে ধর্মের ভূমিকা ব্যক্তিগত অনুভূতি ও নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়; সমাজ, আইন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

এখন এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।

১.স্বাধীনতা(Liberty)

পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতার অর্থ হলো, ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার দায়িত্ব নেওয়া ব্যক্তির অধিকার। Right to define good and bad. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতা রয়েছে সে নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে।-(২) প্রকৃত কল্যাণ এটাই যে, মানুষ নিজে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার

ক্ষমতা রাখবে। (Good is the right of individual)- (৩) আমি যা ইচ্ছা তাই করব এবং যেই পদ্ধতি পছন্দ সেই পদ্ধতিতেই করব। (তবে এর সীমানা আছে, common good নামে একটা কথা আছে) কোনো অথরিটির কাছে এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসিত নই; সেই অথরিটি বংশ হোক কিংবা মা-বাবা কিংবা হোক খোদা। তার মানে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে- সে যা ভালো মনে করবে, তা করতে পারবে। সমকামিতাকে ভালো মনে করলে সে তাও করতে পারবে। পুরুষকে বিবাহ করবে নাকি মহিলাকে, এটা চয়েজ করার ক্ষমতা ও অধিকার তার আছে। সে পর্দা করবে কি করবে না এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না। কোনো মুসলিম পুজোয় অংশগ্রহণ করলে কেউ এটাকে খারাপ বলতে পারবে না, কেউ বাধাও দিতে পারবে না।

মোটকথা, ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়াই হলো স্বাধীনতা। কারণ তার আকল আছে। আর আকল থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আকলই তার জন্য যথেষ্ট। ফরাসি বিজ্ঞানী দেকার্ত দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এই স্বাধীনতার প্রবর্তক।সাথে জার্মান দার্শনিক 'কান্টেরও' ভালো অবদান আছে এর পক্ষে।দেকার্ত এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে, যেখানে মানুষের আকলবহির্ভূত সবধরনের জ্ঞানই প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ তার কাছে মানুষই জ্ঞানের উৎস। তার বিখ্যাত উক্তি হলো I think there for I am. আমি চিন্তা করি বলেই আমি 'আমি'।

মানুষ তার সত্তা ছাড়া যেকোনো বিষয়ে সন্দেহ করতে পারে। একমাত্র তার অস্তিত্বই নিশ্চিত। সুতরাং ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের নিজ সত্তার। আর তা করবে আকল। দার্শনিক কান্টের ভাষায়, আকলের এমন ক্ষমতা রয়েছে, সে পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারে। আর প্রত্যেক মানুষই আকলসম্পন্ন। তাই সে নিজেই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে পারবে। এটা জানার জন্য সে আল্লাহ ও নবী-রাসুলদের শিক্ষার মুখাপেক্ষী নয়। মোটকথা, তারা আল্লাহর স্থানে মানুষকে আর নবী-রাসুলদের শিক্ষার স্থানে আকলকে বসিয়েছে। এর ফলে যে মানব-সত্তা অস্তিত্বে আসে, তাকে খায়েশের গোলাম বলা যেতে পারে। অথচ সে খায়েশ পূরণ করার নেশায় নিজেকে সর্বস্বাধীন বলে দাবি করে।

স্বাধীনতা অর্জন করার বস্তুগত উপাদান হলো পুঁজি। যে যত বেশি পুঁজি অর্জন করতে পারবে সে ততই স্বাধীন। কারণ তার পুঁজি যত বৃদ্ধি পাবে সে তত বেশি খায়েশ পূরণ করতে পারবে। আর এই চিন্তা থেকেই সে নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা পুঁজি অর্জন করার পেছনে ব্যয় করবে। বলা যায়, স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ও বিকশিত রূপই হলো পুঁজিবাদ। স্বাধীনতার এই পাশ্চাত্য চেতনা ছাড়া পুঁজিবাদ অস্তিত্বে আসতে পারে না।

-

[(২)values are not recognaized by you,values are determined by you.
সে-ই স্বাধীন ব্যাক্তি,যে নৈতিকতার স্রষ্ঠা,নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে(creator of values)।(The Human Person in Contemporary Philosophy ,Frederick C. Compleston; PHILOSOPHY ; vol.25,No.92(Jan..1950),pp.3-19)
(৩)মাকালাতে তাফহিমে মাগরিব,ড.জাহিদ সিদ্দিক মোগল;৮৪]

১.১ স্বাধীনতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতাকে একটি উদ্দেশ্য এবং মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়। freedom as value. পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দাবি করে যে, রাষ্ট্র এমন পলিসি গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করতে পারার ক্ষমতা তৈরি হবে।-(৪)তার এই পথে কেউ বাধা হতে পারবে না (তবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খর্ব করার অর্থে এর একটা সীমানা আছে...)।

-

[(৪) হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্যক্তিকে সক্ষমতা দেবার জন্য, যাতে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে পারে শান্তিতে। ব্যক্তিই সব। (The Human Person in Contemporary Philosophy, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19)]

-

পক্ষান্তরে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা হলো আল্লাহকর্তৃক সংজ্ঞায়িত ভালো-মন্দের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার যোগ্যতা। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে তাকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং তার মাঝে এই যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে হক গ্রহণ করে রবের নিষ্ঠাবান গোলাম হয়ে থাকবে অথবা হক অস্বীকার করে খোদাদ্রোহী হবে। অন্যভাবে বললে- ধর্মীয় গণ্ডিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো ধর্মকর্তৃক নির্ধারিত ভালো-মন্দ দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করার যোগ্যতা (ability to choose between good and bad)। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার মানুষের নেই, যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বাধীনতা বলে।

ইসলামে স্বাধীনতার ধারণা এই নয় যে, ব্যক্তি যদি নিজ ইচ্ছায় কুফর গ্রহণ করে তা হলে তা-ই ভালো। বরং এটা মন্দ এবং এর জন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا

হক তো তা-ই, যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করবে। তবে আমি অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি। [সূরা কাহাফ,আয়াত-২৯]

আয়াতের শুরুতেই সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, সত্য তা-ই, যা রবের পক্ষ থেকে আসে। সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করার এখতিয়ার মানুষের নেই। তবে সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মিথ্যা গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে। এটা স্বাধীনতা নয়, পরীক্ষা।

সুতরাং ইসলামে স্বাধীনতা একটি মাধ্যম মাত্র (freedom as resource)| অন্যান্য সৃষ্টিজীবের বিপরীতে মানুষের এই মাধ্যম ও যোগ্যতা রয়েছে যে, সে আল্লাহর নির্ধারণ-করা ভালো-মন্দ থেকে একটি গ্রহণ করতে পারবে। মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার অধিকার নয়; বরং তাকে রবের কাছে অর্পণ করে দেওয়া। আরো স্পষ্ট করে বললে ইসলামে আবদিয়্যাতই হলো মূল বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ভালো মন্দ গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে। কিন্তু ধর্ম কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মন্দ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। এজন্য মুসলমানদের পলিসি তা-ই হবে, যা আবদিয়্যাত তথা আল্লাহর আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমা অর্থে স্বাধীনতাকে দৃঢ় করে এমন কোনো পলিসি মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না।

বুঝা গেল, পশ্চিমা স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে আবদিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করে। এটা অস্বীকার করে যে, মানুষ আল্লাহর বান্দা; তাই তার একমাত্র কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। কারণ, স্বাধীনতার মূল কথা দাঁড়ায়, মানুষের প্রকৃত অধিকার, প্রভুত্বের দাবি (self-determination), যা মূলত হেদায়েত লাভের মাধ্যম খোদায়ি প্রত্যাদেশ মেনে নেওয়াকে অস্বীকার করে। সাথে এটা ইসলামের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে। এই স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার অর্থ হলো- ইসলামও সত্য। ইসলাম একমাত্র সত্য নয়। সত্যের কয়েকটি ধারণার মাঝে ইসলাম একটি। এর বাইরে আরো সত্য আছে। অথচ ইসলাম দাবি করে, সে একমাত্র হক। এর বাইরে যা কিছু আছে, সব বাতিল ও ভ্রান্ত।

১.২ স্বাধীনতার ইসলামিকরণ

স্বাধীনতার ইসলামিকরণ দুইভাবে করা যায়।

এক. পশ্চিমা স্বাধীনতার সংজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখে।

দুই. পশ্চিমা স্বাধীনতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে।

প্রথম শ্রেণি পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে দলিল পেশ করে। যেমন সুরা কাফিরুনসহ কুরআনুল কারিমের যেসব আয়াতে বলা হয়েছে- 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমাদের ধর্ম আমাদের', বা 'তোমাদের যা ইচ্ছা তা গ্রহণ কর'। অথবা 'যে চায় ঈমান আনুক, যে চায় কুফরি করুক'।

মূল বিষয় হলো বিভিন্ন দিক থেকে তারা এই আয়াতগুলোর মর্ম বুঝতে যেয়ে ভুলের শিকার হয়েছে। এই ব্যাপারে তবে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটা পয়েন্ট তুলে ধরা হলো -

এক. মুফাসসিরগণের মতে আয়াতগুলো যেকোনো চিন্তা বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার অনুমোদনমূলক নয়; বরং ধমকিমূলক। যেমন অধীনস্থরা কথা না শুনলে আমরা রাগ করে বলি- 'তোমার যা ইচ্ছা করো।' এটা 'যা ইচ্ছা' তা করার অনুমোদন নয়; বরং নির্দেশিত কাজটি করার জন্য একটি রাগত উচ্চারণ। কুরআনুল কারিমের বর্ণনাগুলো এমন।

দুই. পশ্চিমা স্বাধীনতার দৃষ্টিতে ব্যক্তি যা করবে, তা-ই ভালো হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। সে নিজেই ভালো-মন্দের নীতিনির্ধারক। কিন্তু এ আয়াতগুলোতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দেওয়ার পর মানুষকে 'অপশন' প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর নির্ধারিত ভালো গ্রহণ এবং মন্দ বর্জন না করলে শাস্তির কথাও এসেছে।

সুতরাং বলা যায়, এই শ্রেণি না পাশ্চাত্য স্বাধীনতা বুঝেছে আর না পবিত্র কুরআনের আয়াতের মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছে।

তিন. অধিকার কখনো মন্দ বিষয়ে হতে পারে না। ফলে ইসলামের নির্ধারিত ভালো-মন্দ থেকে কেউ যদি স্বাধীনতার ভিত্তিতে মন্দটা গ্রহণ করে তা হলে তা মন্দই থাকবে। আমরা তাকে খারাপ, জুলুম ও অনধিকার চর্চাই বলব। তাকে ভালো বলতে পারি না। তাকে অধিকার বলা মানে ইসলাম যে একমাত্র মানদণ্ড তা অস্বীকার করা এবং ইসলামকে কয়েকটি 'কল্যাণ-ধারণা'র একটি মনে করা, যেন ইসলাম একমাত্র কল্যাণকর দীন নয়, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন।

আর দ্বিতীয় শ্রেণির দাবি হলো, ইসলামও স্বাধীনতাকে বাস্তবায়ন করে। তবে ইসলামের স্বাধীনতা হলো বান্দাকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামিতে নিয়ে আসা। অর্থাৎ তারা দৃষ্টিভঙ্গিজনিত স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সংজ্ঞা পরিবর্তন করে। কথাটি আপন জায়গায় ঠিক থাকলেও পশ্চিমাদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে দুই দিক থেকে এখানে ভ্রান্তি রয়েছে।

প্রথমত স্বাধীনতার একটি ঐতিহাসিক সংজ্ঞা রয়েছে, পারিভাষিক রূপ রয়েছে। তা হলো নফসের পূজা। পশ্চিমারা স্বাধীনতা দ্বারা এ কথাই উদ্দেশ্য নেয়। এখন তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামিস্টদের স্বাধীনতার স্লোগান মানুষকে বিভ্রান্ত করে। পশ্চিমা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করে। এজন্য যেকোনো বিতার্কিকের উচিত হবে 'ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দেয়' এই

বিতর্কে যাবার আগে পশ্চিমা স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সংজ্ঞার সাথে ইসলামি স্বাধীনতার সংজ্ঞাগত পার্থক্য পরিষ্কার করা। তা হলে সেই ধারণা আর প্রতিষ্ঠিত হবে না, যা পশ্চিমারা কামনা করে।

দ্বিতীয়ত ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে স্বাধীনতা দিতে চায়- তা নয়! বরং ইসলামও মানুষকে গোলামিতে আবদ্ধ করতে চায়; তবে পার্থক্য-সেই গোলামি হলো রবের। আমাদের প্রকৃত মালিকের। ইসলাম অবশ্যই মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চায়; কিন্তু তারপর ইসলাম চায় মানুষ যেন আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে নেয়। এই কথাটিই কাদেসিয়ায় রুস্তমের দরবারে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল সাহাবি রিবই ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষায়। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমরা এখানে কেন এসেছ? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে এখানে আসার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে আমরা তার ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্বে, সংকীর্ণ পৃথিবীর মোহ থেকে প্রশস্ত জান্নাতের দিকে, খ্রিষ্টান ধর্মের অত্যাচার থেকে বের করে ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম ইসলামের দিকে নিয়ে যেতে পারি।-(৫)

-

[-(৫)- তারিখু তাবারি-৩/৫২০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/৬২২।]

-

আমরা আল্লাহর গোলাম। এটাই আমাদের পরিচয়। আমরা পশ্চিমা অর্থে স্বাধীনতা চাই না। আমরা অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই। চাই নিজের দাসত্ব থেকেও মুক্তি। পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের তাদের ভাষায় কথা বললে চলবে না। এতে তাদের সভ্যতারই উন্নতি হবে। আমাদের কথা বলতে হবে আমাদের ভাষায়। নিজস্ব শৈলীতে।

আমাদের বুঝতে হবে আদতে কোথাও স্বাধীনতা নেই। সবাই কারো না কারো গোলামি করছে। কেউ প্রবৃত্তির গোলামি করছে, কেউ করছে শরিয়তের। কেউ পাশ্চাত্যের গোলামি করছে, কেউ করছে ইসলামের। কেউ মানুষের গোলামি করছে, কেউ করছে আল্লাহর। বস্তুত গোলামি পাওয়ার একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। পৃথিবীতে তার গোলামি ছাড়া কারো গোলামি করার অনুমোদন নেই। কাফেরদের সাথে আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামি প্রতিষ্ঠা করা। আমরা গোলামির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করি; স্বাধীনতার জন্য নয়।

২.সমতা(Equality)

পাশ্চাত্য স্বাধীনতা যখন এটা মেনে নিয়েছে যে মানুষের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার তার নিজের তখন প্রত্যেকের জন্য জরুরি হলো, সে অন্যের ব্যাপারেও এই সম-অধিকার মেনে নেবে। তাকে মানতে হবে, আমি যেমন নিজেরটা ঠিক করি, আরেকজনও তারটা ঠিক করবে। তার মাপকাঠিও ঠিক, আমারটাও ঠিক। ভালো-মন্দের সমস্ত মাপকাঠি সমান।কোনো মাপকাঠিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। সবার নির্ধারিত ভালো-মন্দকে সমপর্যায়ের জ্ঞান করতে হবে। এটাই পাশ্চাত্য সমতা।-(৬) অন্যভাবে বললে, মানুষ নিজ মস্তিষ্ক দিয়ে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে। আর প্রতিটি মানুষেরই মস্তিষ্ক রয়েছে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিচারে যেহেতু সবাই সমান; তাই বিশ্বাস ও অধিকারের প্রশ্নেও সবাই সমান হবে। নারী-পুরুষ, কাফের-মুসলিম, বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে সবাই সমান। এই হিসেবে প্রতিটি ধর্মই সমান। কোনো ধর্মকে খারাপ বলা যাবে না, যদিও তা কুফর হয়। শিরক হয়। প্রত্যেক ধর্মকেই এক সমান মনে করতে হবে। কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা ব্যবহার করে কুফরকে বেছে নিলে তাকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। কোনো হারাম অবলম্বন করলেও তাকে মন্দ বলা যাবে না। সবার চয়েজকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

[(৬)-ইসলামি ব্যাংকারি আওর জুমহুরিয়্যত-১৮১]

২.১ ইসলামের দৃষ্টিতে সমতা

ইসলামের দৃষ্টিতে সমতার এই ধারণা আল্লাহর নেজামে হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। সমতা মানে এই দাবি করা যে 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের ভালো-মন্দ চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য নবী-রাসুলদের মাধ্যমে কোনো সূত্র প্রতিষ্ঠা করেননি। এমনকি মানুষের কাছে এমন কোনো খোদায়ি প্রত্যাদেশ নেই, যা অকাট্য এবং যার ভিত্তিতে খায়েশ ও আমলের মাঝে প্রাধান্য দানের মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে।' নেজামে হিদায়েতের মর্ম হলো, সমস্ত মানুষের খায়েশ ও কর্ম সমমর্যাদার নয়; বরং যে ব্যক্তির কর্ম নবীদের শিক্ষা অনুযায়ী হবে সে অন্যান্যের উপর প্রাধান্য পাবে। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও সমতাকে কোনো সামাজিক মাপকাঠি ও উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ইসলামি রাষ্ট্র ভালো-মন্দের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হয়ে সমস্ত 'ভালোর ধারণা'কে সমানভাবে সংরক্ষণ করবে, সেই সুযোগ নেই। বরং ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর নাজিলকৃত একমাত্র কল্যাণের ধারণাকে অন্যান্য কল্যাণের ধারণার (সেগুলো মূলত অকল্যাণ) উপর বিজয়ী করা। সেগুলোর সাথে আপস করা এবং সম-অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের পলিসি নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا

তিনি তার রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সেই দীনকে অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী করেন।-[সূরা ফাতহ,আয়াত-২৮]

ইসলামই একমাত্র ভালো। ইসলামের বাইরে অন্য কোনো ভালোর ধারণা নেই যে তাকে সমান ভাবতে হবে কিংবা তার সাথে সমতা রক্ষা করতে হবে। আর ইসলাম সমতাকে নয়; আদল (ন্যায়) প্রতিষ্ঠা করে। কারণ ইসলামই একমাত্র ন্যায়। এর বাইরে ন্যায়ের কোনো ধারণা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেসব বিধান দিয়েছেন, সেগুলোই আদল। আদলের সংজ্ঞা, সীমা ও প্রকৃতি ইসলামই নির্ধারণ করবে। ইসলামের বাইরে এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার ভিত্তিতে আল্লাহর বিধানকে আদলের সার্টিফিকেট দিতে হবে। সুতরাং একজন কাফেরকে মন্ত্রী হওয়ার অধিকার না দেওয়াই আদল। কারণ কুফর সত্তাগতভাবেই অনিষ্টকর। আর যে তা ধারণ করে তার নেতৃত্ব কখনোই আদল হতে পারে না। এখানে সম-অধিকারের প্রশ্ন তোলা যাবে না। সামগ্রিকভাবে ইসলাম আদলকে রক্ষা করে; পশ্চিমা অর্থে সমতাকে নয়।

অন্যভাবে বললে, ইসলাম অবস্থানুসারে প্রত্যেকের পর্যায় রক্ষা করার কথা বলে; সমতার নয়। ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া বা খোদাভীতি। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য লিবারেল রাষ্ট্রের মতো প্রত্যেক সদস্যের জন্য নিজ নিজ খায়েশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার অধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিত করা নয়। বরং তাদের খায়েশকে নেজামে হিদায়াতের (ওহির) অনুগামী করার পরিবেশ তৈরি করা। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে citizen (এমন সাধারণ জনতা, যারা মূলত শাসক ও সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয়ে থাকে) এবং representation of citizens (জনপ্রতিনিধি) এর কোনো ধারণা নেই। কারণ ইসলামে সাধারণ জনতা citizen নয়; বরং প্রজা হয়ে থাকে। আর খলিফা এমন কোনো জনপ্রতিনিধি নয়, যার দায়িত্ব হবে সাধারণ লোকদের খায়েশ মোতাবেক সিদ্ধান্ত দেওয়া। বরং সে আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতিনিধি। তার লক্ষ্য প্রজাদের খায়েশকে শরিয়তের অনুগামী করার জন্য ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা এবং সমতার অর্থ হলো আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ও আদলের বিপরীতে মানুষ নিজেই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে। প্রত্যেকের নির্ধারিত ভালোর ধারণা ও জীবনাচার সমাজে সমান অবস্থান রাখে। আর তখন রাষ্ট্রের কাজ হবে এমন সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ খায়েশ পূরণ করবে এবং তা অর্জন করার জন্য তারা সক্ষম হয়ে উঠবে।*-(৭)

-

[(৭)-হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্যক্তিকে সক্ষমতা দেবার জন্য, যাতে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করতে পারে শান্তিতে। ব্যক্তিই সব। (The Human Person in Contemporary Philosophy, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), pp. 3-19)]

২.২ সমতার ইসলামিকরণ

কোনো কোনো মুসলিম ইসলামের মাধ্যমে সমতার সেই অর্থ প্রমাণ করতে চায়, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার আকিদার অংশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোনোভাবে নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কিছু সমতার দৃষ্টান্ত দেখাতে। এই ধরনের খণ্ডবিখণ্ড দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তারা মানুষকে এ কথা বুঝাতে চায় যে, ইসলামও সামগ্রিকভাবে সমতার শিক্ষা দেয়। মূলত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদল*-(৮)সমতার রূপে প্রকাশ পায়। তার মানে এই নয় যে ইসলাম সামগ্রিকভাবে সমতাকে গ্রহণ করে এবং এটাকে মূলনীতি কিংবা মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমতা জুলুম হয়ে যায়। তাদের মানসিক দৈন্যের অবস্থা এমন যে তারা পাশ্চাত্য সমতাকে এক অকাট্য এবং প্রশ্নাতীত মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিয়েছে, যেন ইসলামকেই পাশ্চাত্য মানদণ্ডে বিচার করে দেখা লাগবে। মূলত এদেরকে মডার্নিস্ট বলা হয়। মডার্নিস্টরা পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির আলোকে ইসলামকে পর্যালোচনা করে। ইসলামের কোনো বিষয় যদি এগুলোর সাথে মিলে যায় তা হলে তা গ্রহণ করবে। আর না মিললে পাশ্চাত্যের সাথে খাপ খাইয়ে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করবে। এভাবেই তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়, যা প্রকারান্তরে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

যেসব আয়াত ও হাদিসে বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমতার দৃষ্টান্ত এসেছে, মডার্নিস্টরা সেগুলো ব্যবহার করে পাশ্চাত্য সমতাকে ইসলামি করার প্রয়াস চালায়। মনে রাখতে হবে বিধান প্রয়োগ আর অধিকার এক নয়। বিধান প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হলো, একজন সাধারণ লোক চুরি করলে তার উপর যেমন হাত কাটার হদ প্রয়োগ হবে তেমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই বিধান সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে।* -(৯) কিন্তু অধিকারের প্রশ্নে সবাই কখনো সমান পাবে না। যে যার যোগ্য ও হকদার তা পাওয়াই হলো ইনসাফ বা ন্যায়। ইসলাম ন্যায়ের কথা বলে। সমতার মাঝেই ন্যায় নিহিত নয়। সমতা অনেক সময় জুলুম হয়। কখনো কখনো ন্যায় হয়।একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজ হবে। ধরা যাক এক ব্যক্তি দুই ছেলে এবং চার লক্ষ টাকা রেখে মারা গেল। তার উভয় সন্তানই ২ লাখ করে পেল। এই ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা একসাথে পাওয়া গেল। আরেক ব্যক্তি দুই ছেলে ও এক মেয়ে এবং ৫ লাখ টাকা রেখে মারা গেল। তার দুই ছেলে দুই লাখ করে চার লাখ আর মেয়ে এক লাখ পেল। এ ক্ষেত্রে সমতা নেই; তবে ন্যায্যতা পাওয়া গেছে। আরেকজন তিন ছেলে ও দুই মেয়ে এবং ১০ লাখ টাকা রেখে গেল। আর প্রত্যেকেই ২ লাখ করে টাকা গ্রহণ করল। এই ক্ষেত্রে সমতা পাওয়া গেলেও ইনসাফ পাওয়া যায়নি। এই সমতা জুলুম। এজন্য ইসলাম ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমা সমতার কথা বলে না। বরং ইসলাম আদলের কথা বলে, যা প্রত্যেককেই দেয় তার নির্ধারিত প্রাপ্য।

-

[(৮)-ইসলাম সঙ্গায়িত ইনসাফ,যা সমতা নয় বরং প্রত্যেকের অবস্থা ও দায়িত্বের পরিধি বিচার করে সিদ্ধান্ত দেওয়া।
(৯)-জাওয়াহিরুল ফিকহ-২/৭৮]

-

৩.উন্নতি (Development)

স্বাধীনতা ও সমতার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার তৃতীয় মূলনীতি বা আকিদা হলো উন্নতি। সমস্ত কাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা এই তিন আকিদার আলোকে মূল্যায়ন করে। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি আকিদা ক্ষুণ্ণ হলে তারা তা সহ্য করে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষত স্বাধীনতা এবং উন্নতির সম্পর্কটা আরো গভীর। মূলত স্বাধীনতার বস্তুগত রূপ হলো উন্নতি। এখানে উন্নতি বলতে পুঁজির ধারাবাহিক ও সীমাহীন বৃদ্ধিকে বুঝানো হচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধের এখানে কোনো মূল্য নেই। মানুষ তার খোদায়ি আসনে থেকে সমস্ত খায়েশ পূরণ করার যোগ্যতা একমাত্র পুঁজির মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে। তাই পুঁজির বৃদ্ধিই উন্নতি। উন্নতি মানে অঢেল অর্থ। বলা যায়, উন্নতির এই ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক দিক হলো এই উন্নতি, যাকে পুঁজিবাদ বলা যেতে পারে। সম্পদের অসীম ও ক্রমাগত বৃদ্ধিই যখন সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন সম্পদ পরিণত হয় পুঁজিতে। এই অর্থে পুঁজিবাদ হলো হিংসা ও অর্থলিপ্সার বাস্তব রূপ। আর একজন পুঁজিবাদী হলো সেই লোভ ও হিংসার গোলাম। দিনার-দিরহামের পূজারি। একজন পুঁজিবাদী বিশ্বাস করে সম্পদের একমাত্র সঠিক ব্যবহার হলো ক্রমাগত পুঁজিবৃদ্ধি। তার কাছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মূল লক্ষ ইন্দ্রিয়কে সন্তুষ্ট করা এবং স্বাধীনভাবে এটাকে বৃদ্ধি করা। আর এই বৃদ্ধি পুঁজির মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা পুঁজি ছাড়া কামনা-বাসনার পেছনে অন্ধভাবে ছুটে চলা যায় না।* -(১০)
[(১০)-ড.জাবেদ আকবর আনসারি;ইসলামী ব্যাংক : ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর-২০ থেকে উদ্ধৃত]

-

এজন্য যার কাছে যত সম্পদ সে তত স্বাধীন। পাশ্চাত্য দর্শনে এটা স্বীকৃত যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ তখনই হবে যখন সে স্বাধীন থাকবে।* -(১১)আর স্বাধীনতার বিকাশ নির্ভর করে পুঁজির উপর। ফলে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রমাগত পুঁজিবৃদ্ধি। ফলে একজন অর্থনীতিবিদকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় পুঁজিবাদী সমাজে, কোনো ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তি সেভাবে মূল্যায়িত হন না। কারণ একজন অর্থনীতিবিদ তো স্বাধীনতার

বস্তুগত আকৃতি তথা উন্নতির বাহন পুঁজিবৃদ্ধির পথ দেখাবে। পক্ষান্তরে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষটি এমন কোনো বিষয়ের দাওয়াত দেয় না, যার সাথে পশ্চিমা অর্থে উন্নতির বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে। বরং সে দুনিয়াবিমুখতার দাওয়াত দেয়। আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয়ের আহ্বান জানায়। ফলে পুঁজিবাদী কাঠামোতে তার তেমন মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু শরয়ি কাঠামোতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেই হবে, যে তাকওয়ার অধিকারী হবে, যদিও সে পুঁজিহীন হয়।

-

[(১১)-ব্যাক্তির (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা।প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যাক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা' (jean-Paul Sartre, L 'Etre et le Neant)]]

-

উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার প্রথম কথা হলো, পুঁজির ধারাবাহিক এবং সীমাহীন বৃদ্ধি। আর এর চূড়ান্ত চিত্র হলো স্বাধীনতা ও সমতার পরিবেশ তৈরি হওয়া। স্বাধীনতা, সমতা ও পুঁজিবৃদ্ধির পরিধি যত বিস্তৃত হবে, পাশ্চাত্যের ধারণায় সেখানে তত উন্নতি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। অবাধ যৌনতা, নারী-পুরুষের উন্মুক্ত মেলামেশা বৃদ্ধি পাওয়া এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও বাধ্যবাধকতা হ্রাস পাওয়া পাশ্চাত্যের কাছে উন্নতি। বর্তমান পাশ্চাত্যের উন্নতির মানদণ্ড দুটি। জিডিপি বৃদ্ধি পাওয়া এবং স্বাধীনতা ও সমতার পরিবেশ তৈরি হওয়া। উন্নতির এই মাপকাঠিতে দীনি পরিবেশ বৃদ্ধি পাওয়াকে অবনতি ও পশ্চাদগামিতা হিসেবে দেখানো হয়। যে এলাকায় শরয়ি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, পাশ্চাত্য উন্নতির মাপকাঠিতে সেই এলাকা বর্বর, অসভ্য ও অনুন্নত। পাশ্চাত্যের এই মাপকাঠিতে জায়গা নেই ধর্ম, নৈতিকতা, সামাজিক সম্পর্কসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের।

৩.১ ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি

পাশ্চাত্য উন্নতির মূলকথা হলো, নফসকে খুশি করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া। সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ করতে পারা। কিন্তু ইসলাম কামনা-বাসনা ও চাহিদা সীমাহীন হওয়ার স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম বরং দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির চেতনা ধারণ করে। সীমাহীন কামনা-বাসনা পূরণ ও অবাধ মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। ইসলামে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সফলতাই একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজ পাশ্চাত্য উন্নতি এবং তার জন্য উপযুক্ত পলিসি তৈরি করা নয়। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, এমন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা, যেখানে দীনি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, আখেরাতের সফলতা অর্জন করা সহজ হবে, মানুষ যুহুদ ও অল্পতুষ্টির গুণ অর্জন করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই উন্নতি। যেখানে মানুষের পুঁজি বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু

ইসলামি পরিবেশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, তাকে ইসলাম উন্নতি বলে না। ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তা অবনতি। ইসলামের দৃষ্টিতে যা উন্নতি, পাশ্চাত্যের কাছে তাই পশ্চাদগামিতা। অথচ বাস্তবতা হলো, ইসলাম যাকে পশ্চাদগামিতা বলছে পশ্চিমরা তাকেই গ্রহণ করছে আধুনিকতা ও প্রগতি হিসেবে। মহান আল্লাহ বলেন,

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

রাসুল ﷺ হলেন মানবজাতির জন্য একজন সতর্কবার্তা প্রদানকারী। তোমাদের যার ইচ্ছা (তার অনুসরণ করে) উন্নতি করবে। আর যার ইচ্ছা (তার বিরোধিতা করে) পশ্চাদমুখী হবে। - [সূরা মুদ্দাসসির,আয়াত-৩৬,৩৭]

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে জনপদবাসী, তোমরা সরল সঠিক পথে (ইসলামের উপর) অবিচল থাকো। এটাই তোমাদের জন্য অগ্রগতি। যদি এই পথ ছেড়ে ডান বা বামের কোনো পথ (সভ্যতা, আদর্শ, মতবাদ) অবলম্বন করো, তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট এবং পশ্চাদমুখী হয়ে পড়বে।' - [বুখারি-৭২৮]

সুতরাং বুঝা গেল, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতির মূলকথা হলো দীনি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহর দ্বীন মানা সহজতর হওয়া এবং শরিয়াহর প্রতিটি আইন প্রতিষ্ঠিত থাকা। পাশ্চাত্যের জিডিপি আর বস্তুগত উন্নয়ন ইসলামের দৃষ্টিতে আসল উন্নতি নয়। আধুনিক মুসলিমদের একটি বড় সমস্যা হলো, তারা বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বে উন্নতির স্বরূপ খুঁজতে যায়। কিন্তু তারা ভুলে যায়, মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে উন্নত যুগ ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং সালাফদের যুগ। তৎপরবর্তী প্রতিটি যুগই মুসলিমদের অবনতি নিয়ে হাজির হয়েছে। আধুনিক মুসলিমদের আপত্তি হলো, মোল্লারা আমাদের ১৪০০ বছর পেছনে নিয়ে যেতে চায়। নিঃসন্দেহে হুজুররা চায়, দুনিয়া আবার সেই জায়গায় ফিরে যাক, যেখানে রাসুলের যুগে ছিল, সাহাবিদের যুগে ছিল, সালাফদের যুগে ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সেগুলোই ছিল সবচেয়ে উন্নত যুগ। উম্মতের প্রথম সারির মনীষীদের জীবনধারাই পরবর্তী লোকেদের উন্নতির সোপান।

পাশ্চাত্য দুনিয়া আমাদের প্রশ্ন করে পুরো ইসলামি ইতিহাসে তোমরা নিউটনের মতো একজন বিজ্ঞানী দেখাও তো পারলে! এর উত্তরে পালটা আমরা ফারাবি, ইবনে হাইসাম, ইবনে হাইয়ানদের দেখাতে যাব না। বরং আমরা সুফিয়ান সাওরি, আবদুল কাদের জিলানির মতো মনীষীদের দেখাব। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ি, তাবেতাবেয়ি, আম্বিয়ায়ে কেরামসহ আকাবির-আসলাফের পবিত্র জামাতের কাউকে উপস্থাপন করে বলব তোমরা পারলে পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এমন কাউকে দেখাও! ইবনে হাইসাম আর ফারাবি নিঃসন্দেহে আমাদের লোক। তবে বুঝতে হবে, তারা যে কারণে প্রসিদ্ধ- সেই অঙ্গনটা আমাদের উন্নতির মাপকাঠি নয়।

আমরা অন্য আলোচনায় তাদের প্রসঙ্গ টানতে পারি। তবে এই প্রশ্নের উত্তরে নয়। কারণ এই প্রশ্ন শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠির, এই প্রশ্ন আত্মোন্নয়নের সিঁড়ির, এই প্রশ্ন সভ্যতার মানদণ্ডের। পাশ্চাত্য এই প্রশ্ন এজন্যই করে যে, তাদের কাছে বস্তুগত উন্নতিই সবকিছু। কিন্তু আমাদের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্র ভিন্ন। পাশ্চাত্য আর ইসলামের কাজের জায়গা আলাদা। এজন্য তাদের এরকম প্রশ্নে ফারাবি আর ইবনে হাইসামদের দেখানোর অর্থ হলো, নিজেদের উন্নতির সর্বোচ্চ মাকাম নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা। নিজেদের আত্মোন্নতির সিঁড়িকে তুচ্ছ ভাবা। সর্বোপরি আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভোগা। আমাদের কাছে চির উন্নত ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফ ও পূর্বসূরিদের পবিত্র জামাত। আমাদের সভ্যতার প্রথম কথা হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং তাকওয়া অর্জন করা।

এমন পরাজিত মানসিকতার কারণেই আমাদের শিশু, তরুণ ও যুবকরা সাহাবায়ে কেরামের মতো হতে চায় না। সালাফ ও পূর্বসূরিদের জীবনবৃত্তান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হয় না। তাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে না। কারণ তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম- পার্থিব উন্নতি এবং এইজাতীয় প্রতিভার কিছু চরিত্র বসবাস করে। আমাদের এমন পরাজিত মানসিকতা নতুন প্রজন্মকে তাদের কেবলা ভুলিয়ে দিচ্ছে।পাশ্চাত্য চরিত্র তাদের রঙিন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। মুসলিমদের ভেতর থেকেই তৈরি হচ্ছে এক আত্মপরিচয়হীন জাতি!

মুসলিম সমাজে সেকুলারিজম অনুপ্রবেশের ইতিহাস-

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজ একসময় ধর্মীয় দোদুল্যতায় ভূগছিল, যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উর্বর ভূমি ও অনুকূল পরিবেশ, তখন সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নামক বিষবৃক্ষটি জন্ম নেয় ও বেড়ে উঠে। ফ্রান্সে ঘটে যাওয়া প্রসিদ্ধ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম ফ্রান্সই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উপর রাষ্ট্রীয় কাঠামো দাঁড় করায়। এ মতবাদটি যদিও তার অভ্যন্তরে নাস্তিকতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে দূরে সরিয়ে রাখা, এমনকি দ্বীনের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষ ও দ্বীন বিরোধিতা ইত্যাদি মারাত্মক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড লালন করত, তারপরও তখনকার সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আত্মপ্রকাশ ও তার অনুশীলন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অদ্ভুত ছিল না, কারণ;

প্রথমত: সে-সময় তাদের ঈসায়ী দ্বীন আল্লাহর নিখাদ ওহী ভিত্তিক ছিল না, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসা ইবনে মারয়াম 'আলাইহিস সালামের নিকট প্রেরণ করেছেন, বরং তাতে বিকৃতি ও মিথ্যার হাত অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই তাদের দ্বীন ছিল বিকৃত, পরিবর্তিত, বর্ধিত ও হ্রাসকৃত, যা মানব কল্যাণের বিপরীত অবস্থান নিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথেও তা ছিল সাংঘর্ষিক। সে-সময় ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দানকারী গির্জাগুলো তাদের সন্ন্যাসী ও সংসারবিরাগীদের বিকৃতি ও পরিবর্তনকে শুধু

সমর্থন নয়, দ্বীন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা পালন করা ও যার উপর অটল থাকা তখন প্রত্যেকের উপর ফরয ছিল। বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের বিরুদ্ধে গির্জায় অভিযোগ করা হয়, ফলে গির্জা তাদেরকে শাস্তি দেয়, কারণ তারা বিকৃত দ্বীনের বিপরীত আবিষ্কার করেছে, তাদেরকে যিন্দিক ও নাস্তিক বলে অপবাদ দেয়, অতঃপর তাদের অনেককে করা হয়েছে হত্যা, আবার অনেককে দেওয়া হয়েছে জ্বালিয়ে এবং তাদের বহুসংখ্যককে করা হয়েছে জেলে বন্দি।

দ্বিতীয়ত -খৃস্টানদের ধর্মীয় মুখপাত্র- গির্জাগুলো অত্যাচারী বাদশাহদের সাথে অনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাদেরকে পবিত্র ও নিষ্পাপ সত্ত্বা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা প্রজাদের উপর যে জুলম ও অত্যাচার করত, গির্জাগুলো সেগুলোর বৈধতা প্রদান করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এটাই প্রকৃত ধর্ম, যার শরণাপন্ন হওয়া ও যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সবার জন্য জরুরি।

তাই মানুষ গির্জার জেলখানা ও তার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে। তখন খৃস্টীয় দ্বীন থেকে বের হওয়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, জীবন-ঘনিষ্ঠ সকল বিষয় যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও আদর্শ ইত্যাদি থেকে তাকে দূরে রাখা, বরং বিতাড়িত করা ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় ছিল না, কারণ তা জালেমদের পক্ষাবলম্বন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

হায়! তাদের জন্য কতই না ভালো হত, যদি তারা সেই বিকৃত খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করত, কিন্তু তারা সে বিকৃত খৃস্টান ধর্মের উপর বিরক্ত হয়ে সকল দ্বীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজে এ জাতীয় ঘটনার আত্মপ্রকাশ আশ্চর্য কোনো বিষয় নয়, তবে ইসলামে তার কোনো সুযোগ নেই, বরং কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ ইসলামে রয়েছে আল্লাহর ওহী, যার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এ দ্বীন বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত, তাতে কোনো বিষয় বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করা সম্ভব নয়, সে কাউকে পরোয়া করে না, হোক সে রাজা কিংবা প্রজা। সবাই তার শরীয়তের সামনে সমান। এ দ্বীন মানুষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণকারী, এতে একটি বিধান নেই যা তাদের স্বার্থ পরিপন্থী। এ দ্বীন (ইসলাম) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করে। এতে প্রমাণিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা বিজ্ঞানের প্রমাণিত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব দ্বীনে ইসলাম পুরোটাই সত্য, পুরো দ্বীনই কল্যাণ, পুরো দ্বীনই ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ থেকে আমরা বলতে পারি, পাশ্চাত্য সমাজে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ ও অনীহা থেকে যে চিন্তা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী দেশে কখনো তা প্রকাশ পেত না, বরং মুসলিম দেশের কেউ তা শ্রবণও করত না, যদি না থাকত সংঘবদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধ, যা ইসলামের নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ

হালতে ঈমান-শূন্য কতক অন্তর ও সুস্থ চিন্তা-শূন্য কিছু বিবেককে শিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম দেশে বসবাসকারী খৃস্টানরাও বিভিন্ন মিডিয়া ও প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদ আমদানি ও প্রসারের ক্ষেত্রে কম-যায়নি, তাদেরও রয়েছে বড় ভূমিকা ও ক্ষতিকর প্রভাব। অনুরূপ সেকুলারিজম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শিক্ষানবিশরাও ভূমিকা রেখেছে প্রচুর, যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে গিয়েছিল। সেখানে তারা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও তার আবিষ্কার দেখে ফেতনায় পতিত হয়, অতঃপর সে সকল দেশের প্রচলিত প্রথা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আচার-আচরণ বাস্তবায়ন ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিজ দেশে ফিরে আসে। অতঃপর এক শ্রেণির লোক সে সব (বিদেশ ফেরৎ তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী) লোকদের পেশ করা এ সব তথ্য ও নীতিগুলো গ্রহণযোগ্য হিসেবে লুফে নেয়, তাদের ধারণা এরাই উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত এসব বিদেশ ফেরৎ লোকদের দেখা অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি যেগুলো তারা খুব বড় ও মহত চিন্তাধারা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তা এমন সমাজের-যার সাথে দ্বীনের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানতে পারলাম, যা আমাদেরকে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে:

এক. মুসলিম দেশে বাসকারী খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তারা ইসলাম ও

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আল্লাহ তাদেরকে যে স্থানে রাখতে বলেছেন আমরা তাদেরকে সেখানেই রাখব। তাদেরকে মুসলিম দেশে সামান্যতম কর্তৃত্ব ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দেব না। সকল মিডিয়া, প্রচারযন্ত্র ও গণমাধ্যমগুলোর দরজা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য উন্মুক্ত করে রাখব না, বরং বন্ধ করে রাখব, যেন তারা মুসলিমদের মাঝে তাদের বিষ ছড়ানোর সুযোগ না পায়। কিন্তু এ কাজ করবে কে! অধিকন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান সেকুলারিজমের বিষ ছড়ানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন পদ ও পদবী দিয়ে রেখেছে! আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অভিভাবক।

দুই. শিক্ষানবিশদের বহির্বিশ্বে পাঠানোর ঝুঁকিও অনেক। তার পরিণতি ভয়াবহ। অনেক মুসলিম সন্তান এমন চেহারা ও অন্তর নিয়ে সেখান থেকে এসেছে যা নিয়ে সে সেখানে যায়নি। অতএব বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য সেখানে যাওয়া যখন ঝুঁকিপূর্ণ, তখন দ্বীনি ইলম শিখার জন্য সেখানে যাওয়া কিভাবে নিরাপদ, বিশেষ করে আরবি কিংবা ইসলামী বিষয়াদি শেখার জন্য?! আরবি কি আমাদের মুসলিমদের ভাষা, নাকি তাদের ভাষা?! কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছে আমাদের ভাষায়, না তাদের ভাষায়?[1]

এটা কি কখনো সম্ভব বা যুক্তি সঙ্গত যে, একজন মুসলিম ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও শরীয়তের বিদ্যার্জন করবে এমন লোকদের থেকে, যারা কট্টর কাফের, ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী?!

[1]অনেকে আরবী ভাষা শিখা ও তার উপর ডক্টরেট হাসিল করার জন্যে অমুসলিম দেশে যায়,এখানে তাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) এর বিভিন্ন রূপ-

সেকুলারিজমের দু'টি রূপ রয়েছে। যার একটি অপরটি থেকে জঘন্য:

প্রথম রূপ: সরাসরি নাস্তিকতা: এ প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তা ধর্মীয় কোনো বিষয় স্বীকার করে না, বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জাতীয় সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারীরা নিজেদের কুফরি, অশ্লীলতা ও কুকর্মে আত্মগর্বী ও অহংকারী। তাদের কুফরির ফয়সালা করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ। আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। কোনো মুসলিম তাদের দিকে ধাবিত হয় না, তবে যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় সে ব্যতীত। এ ধরনের সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) জনসাধারণের নিকট কম বিপজ্জনক, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম নয়, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, মুমিনদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, অথবা জেল দেওয়া অথবা হত্যা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় রূপ: পরোক্ষ নাস্তিকতা[1]:

এ প্রকার নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার উপর ঈমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের শ্লোগান দুনিয়াকে দ্বীন থেকে পৃথক কর। জনসাধারণকে ধোঁকায় ফেলা ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) অপেক্ষাকৃত বেশি বিপজ্জনক। কারণ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে।[2] দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলম না থাকার কারণে তারা সেকুলারিজমকে (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে) কুফরি বলে মনে করে না। এ কারণে মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার সেকুলার (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদের অনুসারী। অনেক, বরং অধিকাংশ মুসলিম তাদের হাকিকত জানে না।

এ প্রকার সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিত থাকে, কেউ তাদের কাফের ও দ্বীন থেকে খারিজ বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় প্রকাশ্য নাস্তিকতাসহ আত্মপ্রকাশ করেনি। তাদের কাফের না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। মুসলিম উম্মতকে দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, তারা যেন এসব সংস্থা ও সংগঠন থেকে আত্মরক্ষা গ্রহণ করে।

অতএব দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো মুসলিম সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের কথা বা লেখনীতে আল্লাহর নাম অথবা রাসূলের নাম অথবা ইসলামের নাম শুনে বা দেখে আশ্চর্য হয় না, বরং তারাই আশ্চর্য হয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

মোদ্দাকথা:

উভয় প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) স্পষ্ট কুফরি, এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয় নেই। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মনেপ্রাণে মেনে নেয়, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। কারণ, ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে, হোক তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক বা সামাজিক কোনো শাখা। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলামের সকল শাখায় পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক মুসলিমের প্রবেশ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ﴾. "হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর"।[3]

কুরআনুল কারিমের কতক বিধান গ্রহণ করে কতক বিধান ত্যাগকারীকে আল্লাহ তা'আলা কাফের বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٥ ﴾

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন"।[4]

ইসলামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের ও পথভ্রষ্ট, যদিও তার প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ের পরিমাণ খুবকম ও সামান্য হয়। অতএব পার্থিব রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সকল বিধান যে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফের বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা।

দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইসলাম বিনষ্টকারী কারণও রয়েছে, যেমন তারা বিশ্বাস করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, অনুরূপ তার ফয়সালা থেকে অন্য কারও বিচার-ফয়সালা উত্তম। এ কারণেও তারা কাফের।[5]

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করল মানুষের তৈরি আইনি সংস্থাগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, অথবা বিশ্বাস করল যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথবা ইসলাম প্রগতির অন্তরায়, অথবা বলল ইসলাম শুধু ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানুষের জীবনের অন্য কোনো অংশে প্রবেশ করার অধিকার ইসলামের নেই"।[6]

[1] এখানে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।কারণ সাধারণ লোকেরা নাস্তিকতা বলতে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করাকেই বুঝায়, অথচ সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাও এক প্রকার নাস্তিকতা, বরং নাস্তিকতার একটি শাখা হচ্ছে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

[2] দ্বীনের সাথে পরোক্ষ নাস্তিকতা বা সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) সংঘর্ষ অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়, কারণ তাদের নিকট দ্বীন হচ্ছে ধর্মীয় কয়েকটি ইবাদতের নাম। তাই এ পরোক্ষ সেকুলারিজম (পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা) যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় ও বায়তুল্লাহ শরীফের হজকে নিষেধ করে না, তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দীন বিরোধী নয়। কিন্তু দীনকে যারা সঠিকভাবে বুঝেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) দীনের সাথে সাংঘর্ষিক। যে মতবাদ মানুষের জীবনের সব শাখায় আল্লাহর শরীয়তকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে স্পষ্ট ও কঠিন ইসলাম বিরোধী কোনো মতবাদ কি আছে? যদি তারা তা বুঝে!

[3] সূরা বাকারা: (২০৮)

[4] সূরা বাকারা: (৮৫)

[5] দেখুন: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. রচিত نواقض الإسلام গ্রন্থের ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকার। আরো দেখুন: শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. রচিত العقيدة الصحيحة গ্রন্থের (২৭) নং পৃষ্ঠা।

[6] দেখুন: শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. রচিত العقيدة الصحيحة গ্রন্থের (২৭) নং পৃষ্ঠা।

ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল-

ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে তার কিছু কুফল বর্ণনা করা হলো:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা

দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা'ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা

দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।

এ মতবাদের অনুসারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।

তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের

হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা'ঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিধর কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: "মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না"। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: "রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে"।

আমরা এখানে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীয় শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন,আমীন।

ইসলামি নৈতিকতাবোধ বনাম পশ্চিমা লিবারেল–সেকুলার নৈতিকতার সংঘর্ষ

আদর্শিকভাবে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি নাস্তিকতা নয়; বরং পাশ্চাত্য সভ্যতা। নাস্তিকতা এর একটি ছোট্ট অংশ মাত্র। পাশ্চাত্যের মূল সংঘর্ষ স্রষ্টা কিংবা ধর্ম অস্বীকার করা নয়; বরং আল্লাহ ও তার দীনের বিশ্বাস ও বাস্তব ক্ষমতা খর্ব করা। অস্বীকারের বিষয়টা গৌণ; মৌলিক নয়। কেউ করতে পারে আবার নাও করতে পারে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাস্তিকতা তথা তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহকে*-(১)অস্বীকার করা গৌণ বিষয় মনে করা হয়; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একমাত্র স্রষ্টা- এ কথা কেউ স্বীকার করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে আল্লাহই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তখনি দেখা দেবে নানান সমস্যা। তার মানে এখানে মৌলিক বিষয় হলো তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ।*-(২)

এমনকি আল্লাহর রাসুল আরবের যেই জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন, সেই জাতিরও মূল সমস্যা ছিল তাওহিদুল উলুহিয়্যাতে। তাদের মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের মৌলিক স্বীকারোক্তি ছিল; কিন্তু আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে তারা একেবারেই অস্বীকার করত।*-(৩)

-

[(১)তাওহিদুর রুবুবিয়্যাত হলো সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা এবং বিশ্বপরিচালনাকারী হিসেবে আল্লাহকে এক মানা। মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকার তাওহিদের মৌলিক স্বীকৃতি দিত। তবে তা তাওহিদ হিসাবে শতভাগ বিশুদ্ধ ছিল না।

(২)তাওহিদুল উলুহিয়্যাত হলো আল্লাহকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হিসেবে মেনে নেওয়া। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে বিধানদাতা হিসেবে মানা। আর তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত হলো আল্লাহর যেসব গুণ আমরা কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে জানতে পেরেছি কোনোপ্রকার অংশীদারত্ব ছাড়া সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, অন্যকাউকে সেসব গুণের অধিকারী না মানা। এই দুই তাওহিদকেই কাফেররা মানত না। এই তাওহিদ-দুটো তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেই সমাজকে জাহেলি সমাজ ও কুফুরি সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

(৩)যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বলুন, তোমরা ভেবে দেখছ কি যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা তারই উপর নির্ভর করে। সুরা যুমার, আয়াত ৩৮।

আয়াতে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে- মক্কার কাফেররা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আসমান-জমিনের স্রষ্টা বলে স্বীকার করত। কিন্তু তিনিই যে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণদাতা,

তারা তা স্বীকার করত না। ফলে অন্যান্য আয়াতে এই শিরকি বিশ্বাসের কারণে তাদের কাফের বলা হয়েছে।

-

নাস্তিকতা কখনোই উম্মতের মাঝে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়নি এবং এর প্রভাবও নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব অনেক বিস্তৃত। আমাদের কিশোর-সমাজ থেকে শুরু করে ইসলামি ঘরানাগুলো পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার ছোবলে আক্রান্ত। বিধ্বস্ত তাদের ঈমানি হালাত। এমনকি নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতায় আকৃষ্ট এমন মুসলিমের সংখ্যাও আমাদের সমাজে কম নয়। একদম নিজের আশেপাশে তাকালেই এর বাস্তবতা দেখা যাবে। নাস্তিক হতে হলে পুরো ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়, মুসলিম কমিউনিটি থেকেও কিছুটা দূরে সরে আসতে হয়। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার ইরতিদাদের কবলে পড়লে বাহ্যিকভাবে ধর্মকর্ম ত্যাগ করতে হয় না। মানুষটি যে পাশ্চাত্য মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের শিকার এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সে ত্যাগ করেছে- এর অনুভবটাও তার মাঝে আসে না। অধিকন্তু নাস্তিকতা ও অন্যান্য সংশয় তৈরি হওয়ার প্রধান কারণও এই পাশ্চাত্য সভ্যতা। ফলে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম ভাবতে পছন্দ করে বটে; কিন্তু চেতনায় ধারণ করে আছে নাস্তিকতা। দেখা যাবে,আমাদের আস্তিক নাস্তিক বিতর্কে অধিকাংশ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে পশ্চিমা নৈতিকতার মান দন্ডকে অকাট্য হিসেবে মেনে নেওয়ার কারণে,যার সাথে রয়েছে ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ।বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন মাত্র কয়েকটি।বিবর্তন আর স্রষ্ঠার অস্তিত্বের প্রশ্ন ছাড়া পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের সাথে প্রাসঙ্গিক তেমন কার্যকর কোনো প্রশ্ন পাওয়া যাবে না।বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাত্ত্বিক কথাবার্তা সাধারণ মুসলিমদের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে না।আবার এই বিতর্কে একান্ত ব্যাক্তিগত কিছু ফ্যাক্টও রয়েছে।সব মিলিয়ে দেখা যাবে মুসলমানদের মধ্যে রিদ্দাহ কিংবা সংশয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে নৈতিকতার সাথে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নই বড় প্রভাব ফেলছে।ইসলামের হুদুদ,কিসাস,জিহাদ,ওয়ালা,বারা,নারী অধিকারসহ এমন নৈতিক বিষয়গুলোতেই মুসলিমরা বেশি হোঁচট খাচ্ছে,সংশয়ের শিকার হচ্ছে।কারণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নের চেয়ে এই প্রশ্নগুলো অধিক জীবনঘনিষ্ট।এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো মানুষের ব্যাক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে বেশি।আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য নৈতিকতা এতোটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে যে,ইসলামের নৈতিকতা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না।দীর্ঘসময় যাবৎ লিবারিজম ও সেকুলারিজম দ্বারা পরিচালিত সমাজে বসবাস করার কারণে আমরা পশ্চিমা নৈতিকতা ও দর্শনকে আমরা পরম সত্য হিসেবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমরা মেনে নিয়েছি এবং এটাকে চ্যালেঞ্জ করার পরিবর্তে নৈতিক মাপকাটি কিংবা কম্পাস হিসেব্ব গ্রহণ করছি।ফলে যখনই পশ্চিমা কাঠামোর সাথে ইসলামের কোনো অবস্থান মিলছে না,তখন কেউ কেউ ইসলাম নিয়ে সংশয়ে পড়ছে এবং শেষমেষ ঘোষিতভাবেই রিদ্দার পথ

বেছে নিচ্ছে।আর অধিকাংশই ইসলামি অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে এই পাশ্চাত্য কাঠামো মেনে নিয়ে অঘোষিতভাবেই ইলজাদে জড়িয়ে পড়েছে।এটা হলো সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা।যেসব আলেম,তালেবুল ইলম,ইসলামিক স্কলার এবং বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজয় বরণ করেছে,তারা এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামের এমন নতুন ব্যাখ্যা হাজির করছে,সালাফদের মাঝে যার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না এবং সেটা পাশ্চাত্য কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিকও হয় না।বরং সেই ওয়েস্টার্ন ফ্রেমওয়ার্কের সাথে খাপ খায়।আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয় মর্ডানিজম ও রিভশিনিজম।*-[৪]

-

[(৪)-মর্ডানিজম হলো শরীয়াহর শিক্ষাকে পাশ্চাত্য দর্শনের মানদন্ডে বিচার করা এবং শরীয়াহর শিক্ষাগুলোকে এমনভাবে বদলে নেওয়া,যাতে ইসলামকে পাশ্চাত্য কাঠামোতে খাপ খাওয়ানো যায়।আর রিভশনিজম হলো শরীয়াহর শিক্ষার আলোকে পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান কার্যক্রমকে শরীয়াহসম্মত বানানোর চেষ্টা করা।উভয়ের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল আছে।তা হলো,দুজনের কেউই পাশ্চাত্য কাঠামোকে আঘাত করতে চায় না এবং জরুরি কিংবা আবশ্যিক মনে করে না।]

এজন্যে আমাদেরকে এমন দাঈ ও স্কলার্দের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় পাশ্চাত্য কাঠামো ও মানদন্ডকে মেনে নিয়ে বিজ্ঞান,স্বাধীনতা,সমতা,উন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামকে সঠিক প্রমাণ করার প্রবণতা ছাড়তে হবে।এটা খুবই দূর্বল এবং রক্ষাত্মক অবস্থান।বরং আমাদেরকে আক্রমনাত্মক অবস্থানে যেতে হবে।উল্টো তাদের মাপকাঠিকে প্রশ্ন করা শিখতে হবে।বলতে হবে বিজ্ঞান কেনো বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত মাপকাঠি নয়!বর্তমান বিজ্ঞান কিভাবে পক্ষপাতদুষ্ট!সমতা,স্বাধীনতা,উন্নতি কেনো ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নয়।প্রশ্ন করতে হবে আল্লাহর একজন দাস কোন অধিকারে স্বাধীনতা চাইবে!ইনসাফের পরিবর্তে সে কোন সাহসে সমতার কথা বলে!কোন অধিকারে সে উন্নতির খোদা প্রদত্ত সঙ্গা বদলে ফেলে!আবার ইসলামের সূত্র ছাড়া ন্যায়,শান্তি এবং অধিকারও কোনো মাপকাঠি নয়।কারণ ইসলামই একমাত্র হক্ক ও ন্যায়।এর বাইরে সবকিছু বাতিল ও জুলুম।জানাতে হবে একমাত্র ইসলামই চূড়ান্ত ও বিশুদ্ধ মাপকাঠি।এভাবে নিজেদের মাপকাঠি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

মুসলিম-মানসে পাশ্চাত্য পূজার যে মূর্তি তৈরি হয়েছে ,তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করতে হবে।আঘাতে আঘাতে ভেঙে ফেলতে হবে।আর এজন্যে জরুরি হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কাঠামো সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং ইসলামের মৌলিক অবস্থান তথা সালাফে সালেহীনের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

সেকুলারধর্মী সমাজবিজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্যাস-

সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতালম্বীরা আরব ও ইসলামী বিশ্বে সংখ্যায় অগণিত, আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন, তাদের অনেকে লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক; কাউকে বলা হয় চিন্তাবিদ, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের বিরাট এক সংখ্যা বিভিন্ন মিডিয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে কর্মরত ও কর্তৃত্বকারী, এ ছাড়া অন্যান্য পেশায়ও তাদের সংখ্যা কম নয়।

এসব পেশায় নিয়োজিত তারা সবাই একে অপরের সহযোগী, সবাই মিলে সেকুলার (বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা যা সত্যিকার অর্থে ধর্মহীনতা সে) মতবাদ প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে, যে কারণে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা আজ মানুষের জীবনের অধিকাংশ শাখায় বিস্তার লাভ করেছে।এমনকি আরব বিশ্বের কোনো কোনো ডক্টর-প্রফেসর ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে বইপত্রও লিখে ফেলেছেন। তারা নিজেদেরকে আলেমও মনে করে থাকেন এবং নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিল দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন যে, ইসলাম নামায, রোযা, ইবাদত-বন্দেগী কীভাবে আদায় করবে তা শিক্ষা দেয়, কিন্তু রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে তা ইসলাম বলেনি। সুতরাং ইসলামে রাজনীতি নেই। (এ কথাটাই আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এভাবে বলে যে, ধর্ম পবিত্র জিনিস। রাজনীতি থেকে এটাকে আলাদা রাখতে হবে।) যা হোক, ঐ আরব সেক্যুলার আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে ইসলাম ইবাদত বন্দেগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার প্রক্রিয়া, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার কথা ইসলামে নেই।

হাদীস দ্বারা দলিল

এরা আমাদের দেশের কারো কারো মতো 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' (শুনেছি কেউ কেউ নাকি নিজেদের ভাষণে সূরা কাফিরূনের এই আয়াতকে বুখারী শরীফের হাদীস বলে থাকেন) দ্বারা দলিল পেশ না করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে দু' একটি হাদীসও পেশ করে থাকেন। এমনই একটি হাদীস হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ-

أنتم أعلم بأمور دنياكم

হাদীসের প্রেক্ষাপট হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাবীরুন নাখল (খেজুর চাষ সংক্রান্ত একটি বিশেষ পদ্ধতি) বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে তিনি তা অপছন্দনীয় বলেছেন। পরবর্তী বছরে ফলন কম হলে তখন তিনি বলেছিলেন-

إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فاتبعوه

অর্থাৎ দ্বীনি বিষয়ে বললে সেটা শুনো, মানো। আর দুনিয়াবী বিষয়ে কিছু বললে মনে করবে তোমাদের এসব বিষয়ে তোমরাই ভালো জান।

এটা তাদের বড় দলিল। কেননা আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন যে, দুনিয়াবী বিষয়ে আমার কথা তোমরা শুনলেও শুনতে পার আবার নাও শুনতে পার। যদি সকল বিষয়ে তার নির্দেশনা মানা আবশ্যিক বিষয় হত তাহলে এখানেও আবশ্যিক হত।

শরীয়তের মেযাজ, খেতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে এসব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই তা সহজে বুঝতে পারে।

উপরোক্ত হাদীসটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু তরজমা দেখেও যে কেউ বুঝে নিবেন যে, এখানে কোনো কৃষিনীতি পেশ করা হয়নি। বরং খেজুর বাগানে ফলন বৃদ্ধির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা নিতান্তই একজন কৃষকের নিজস্ব ব্যাপার। ঠিক যেমন একজন কৃষক তার ক্ষেতে ধান চাষ করবে না গম, সাধারণ জাতের চাষ করবে না হাইব্রিড- এগুলো তার একান্ত বিষয়। যে পর্যন্ত জনস্বার্থের ক্ষতি না হবে ইসলাম তার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কৃষকের এ স্বাধীনতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল বানানোর যৌক্তিকতা কোথায়? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সে প্রেক্ষিতেই বলেছেন-

أنتم أعلم بأمور دنياكم

তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জান।

তাদের এ সকল বক্তব্যের খন্ডন তখনই হয়েছে। বিজ্ঞ আলেমরা যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। ইসলামের এটা বৈশিষ্ট্য। হাদীস শরীফে এসেছে-

لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق

অর্থাৎ আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা সব যুগেই ছিল, থাকবে।

অন্য হাদীসে আছে,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

এরা যুগে যুগই ছিল। ওরা বই লিখেছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও আলেমরা এর কঠোর প্রতিবাদ করেছে।

কারাফীর কিতাব থেকে দলিল

তারা ইমাম কারাফীর কিতাব 'আলইহকাম' থেকেও দলিল দিয়ে থাকেন। সেক্যুলারিজমের কিছু কিছু লোক দাবি করেছেন যে, ইসলামের বড় বড় পন্ডিত, উসূল ও ফিকহবিদগণও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। তার নজির হিসেবে তারা ইমাম কারাফী রাহ.কেও পেশ করেছেন।

ইমাম কারাফী রাহ. তাঁর কিতাবের ২৫ নং প্রশ্নোত্তর অধ্যায়ে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কার্যাবলির কোনো কোনোটি নবী হিসেবে করেছেন, কোনোটি দাঈ-মুবাল্লিগ হিসেবে, কোনোটা হাকেম-রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। কোনোটা কাযী ও বিচারক হিসেবে। আবার কোনোটা বাশার বা মানুষ হিসেবেও করেছেন। এ কথাগুলো

খুবই সুস্পষ্ট। কারাফী রাহ. বিভিন্ন হাদীসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন। ঐ অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়ে নিলে হাদীসের কিতাবগুলো বোঝাও সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনো কোনো গবেষক (!) ইমাম কারাফী রাহ.-এর এ কথাগুলোর উল্টো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল যে কাজগুলো নবী হিসেবে করেছেন সেগুলোই শুধু মুসলমানদের পালনীয় বিষয়। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারক হিসেবে যা করেছেন তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়।

অর্থাৎ তাদের দাবি হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযী হিসাবে, হাকেম হিসাবে যা যা করেছেন তার কোনোটিই অনুসরণীয় নয়। (হ্যাঁ, অনুসরণীয় হতে পারে ঐ অ্যারিস্টটল ও আব্রাহাম লিংকনের মত। তাদের মতো ওনাকেও একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। ইনিও একজন বড় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন।)

গোড়াটা কিন্তু ঐ জায়গায়। অর্থাৎ এই মতবাদ মানলে শরীয়তের বড় একটা অংশকে অস্বীকার করে দিতে হয়। এটাকে গভীর থেকে দেখতে হবে তাহলে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দেশের রাজনীতি বা বিশ্ব রাজনীতির এবং রাজনীতিবিদদের অনেক কথাই আছে স্থূল, যা শুধু বলার জন্যই তারা বলে, মানুষ এগুলোকে হালকাভাবে দেখেই অভ্যস্ত। ধর্মনিরপেক্ষতাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। এর ক্ষতিটা যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে তা অনুধাবন করা বিবেকবান মানুষের কতর্ব্য। কারাফী রাহ.-এর কিতাব থেকে দলিল দেওয়া লোকদের কথার আরো কিছু জবাব একটু পরে বলছি।

আলোচনার শুরুতে আমি এনসাইক্লোপিডিয়ার উদ্ধৃতিতে প্রথমেই দেখিয়েছিলাম যে, তারা সেক্যুলারিজম অর্থ করেছে অহঃর ওংষধস। আসলে খুব সহজে চিন্তা করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে আসে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা যখন থেকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে তখন কিন্তু অন্যান্য ধর্মওয়ালারা রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করেছে এমন নয়। রাষ্ট্রের আইন নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যাথাই ছিল না। খ্রীষ্টানরা তো তাদের ধর্মকে চার্চকেন্দ্রিক করে ফেলেছে আগেই। আরবদের ভাষায়-

دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله

অর্থাৎ ধর্ম মসজিদ পর্যন্ত আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে রাষ্ট্রনায়কদের মাধ্যমে। একটার সাথে আরেকটার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এতকিছুর পর আবার ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখার কেন দরকার হল?

খুব স্পষ্ট কথা। রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখাই আসল উদ্দেশ্য। কেননা একমাত্র ইসলামের নীতিমালাই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

মুসলিম শাসকদের ইসলামী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা পৃথিবীর অনেক অংশই যখন সভ্যতা বিবর্জিত ছিল ইসলামই তখন সভ্যতার রাস্তা দেখিয়েছে।

সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অন্য যে কোনো নীতি থেকে হাজারো গুণ ভালো তা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছে। মূলত এটাই ছিল তাদের বাধা। এ কারণেই হয়তো সেক্যুলারিজমকে Anti Islam বলা হয়েছে। Anti Religion নয়। ধর্মবিরোধী নয়, আসলে ইসলাম বিরোধী। এই সত্যটাকে অনুধাবন করতে হবে। কারণ ধর্মের কথা তারাও বলে। তবে ওটা বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করা পর্যন্তই এবং ডলারের গায়ে In God we trust লিখে দেওয়া পর্যন্তই। অবশ্য এতটুকুতেই ওরা খুশি। এর বেশি দরকারও মনে করে না। তো সেক্যুলারিজম দরকারই হয়েছে ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। এ কারণেই Anti Islam ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়-এ কথা শুনে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বরং ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোটাই ধর্মহীনতা।

শরীয়তে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের মূল ভিত্তি হল আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وان احكم بينهم بما انزل الله

আর তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করুন ঐ আইন দ্বারা, যা আপনারপ্রতি আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।-সূরা মায়েদা : ৪৯

অন্যত্র আছে-

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ...فاولئك هم الكافرون، ...فاولئك هم الفاسقون

যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা জালিম ... তারা কাফির ... তারা ফাসিক।-সূরা মায়েদা : ৪৪, ৪৫ ও ৪৭। এ তিনটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর বিধান ভিন্ন ফয়সালাকারীকে জালিম, কাফির ও মুনাফিক বলা হয়েছে। এ আয়াতগুলো পড়ুন এবং কারাফীর কথার গলদ ব্যাখ্যাকারী সেক্যুলার মুহাক্কিকদের (!) বক্তব্য শুনুন, জবাব আপনিই দিতে পারবেন।

সেক্যুলারিজমের বক্তব্য হচ্ছে, আইন-আদালত, বিচারকার্য এসব চলবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী। রাষ্ট্র যেভাবে আইন করে সেভাবে চলবে। ধর্মের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। ঐ কোনো কোনো সেক্যুলারপন্থী তথাকথিত আলেমের বক্তব্য হল, খলীফারা যে আইনে আদালত ও রাষ্ট্র চালিয়েছেন তা তাদের নিজস্ব বিষয়। এটি ইসলামের কিছু নয়। আপনি উপরোক্ত আয়াত এবং এ সংক্রান্ত আরো যত আয়াত আছে সেগুলো দেখুন। এগুলোতে কি বলা হয়েছে, ঐ সকল হুকুম-আহকাম খলীফাদের পর্যন্ত সীমিত? পরবর্তীদের জন্য তা পালনীয় নয়? দেখুন, সেক্যুলারিজম এমন কোনো বিষয় নয় যে, তার অসারতা সম্পর্কে জবাব দিতে হলে মাটি খুড়ে বের করে দলিল দিতে হবে। বরং শরীয়তের বিষয়গুলো হল

ليلها كنهارها

অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এখানে অস্পষ্টতা বা অন্ধকারের স্থান নেই। ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে আইন-আদালত, রাষ্ট্রনীতি সব কিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। কিন্তু এখন ভাবটা এমন যে, নামায, রোযা ইত্যাদি মানুষকে তাদের ধর্ম মতো করতে দাও। (আসলে এটিও কথার কথা, না হয় আপনি কি নামায ঠিকমতো আদায় করতে পারছেন, জুমআর খুতবায় খতীব সাহেবেরা কি কুরআন-হাদীসের কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারছেন, দুআ-মুনাজাতও কি তারা তাদের মতো করে করতে পারছেন? উত্তর আপনাদের জানা আছে।) আর রাষ্ট্র ও আদালত পরিচালিত হবে মানবরচিত আইনে। সুতরাং কুরআনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক তিনি মীরাছের হিস্যা তার মতো করে বণ্টন করে দিতে পারবেন। এর জন্য মুসলিম স্কলারের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বিচারক নিজেই লিবারেল ও স্বাধীন। ফতওয়া সম্পর্কে ধারণা থাকুক বা না থাকুক, এমনকি ফতোয়ার সঠিক সংজ্ঞাও যদি জানা না থাকে তিনি ফতোয়া অবৈধ বলে দিতে পারবেন এবং বলতে পারবেন যে, ফতওয়া দিতে পারবে শুধু উচ্চ আদালতের বিচারক। ফতওয়া দেওয়ার আইনগত কর্তৃপক্ষ হল কোর্ট।

সেক্যুলারিজমটা এমনই। অন্য ধর্মের ব্যাপারে এর তেমন মাথাব্যাথা নেই। তাদের বিরোধিতারও দরকার নেই। কারণ অন্য ধর্মওয়ালারা এ নিয়ে কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি করে না। ইন্ডিয়ার উগ্রপন্থী বিজেপি কি কখনো দাবি উঠিয়েছে যে, গীতা, মহাভারত অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে হবে? খ্রীষ্টানরাও একথা বলেনি। কারণ তাদের নিকট ইসলামের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিগুলোই নেই। এই অতুলনীয় ও সুমহান নীতি কেবল ইসলামেরই রয়েছে। সেক্যুলারিজম এসেছেই ইসলামকে প্রতিহত করার জন্য, স্রষ্টার আইনের বদলে নিজেদের মনমতো করে মানুষকে শাসন করার জন্য।

কিছু মোটা কথা

আপনি পুরো কুরআন মজীদ, বিশেষ করে মাদানী সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন তাতে নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদির বাইরে অন্যান্য বিষয়ের আরো কত আয়াত রয়েছে। হাদীসগ্রন্থগুলোতে ইবাদাত অধ্যায়গুলোর তুলনায় পরিবারনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি, লেনদেন পদ্ধতি, কৃষি-সেচ ইত্যাদি অধ্যায়গুলোর হাদীস সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব করুন তাহলে দেখবেন দ্বিতীয় অংশের হাদীসের সংখ্যা কত বেশি। সেক্যুলারিজম মানতে হলে আপনাকে ঐসব কিছুই এখন রহিত হয়ে গেছে-ঘোষণা করতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি

বলতে পারবেন যে, এই আয়াত ঐ সন পর্যন্ত, ঐ প্রজন্মের জন্য ছিল? এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হল হুদূদ-কিসাস কার্যকর করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেক্যুলার হওয়ার কারণে তাকে কিতাবুল হুদূদের হাদীসগুলোতে, সূরা নূরের আয়াতসমূহে টীকা লাগিয়ে দিতে হবে যে, এগুলো প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। তাই সেক্যুলারিজম নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। দৃঢ়তার সাথে বুঝতে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ লা দ্বীনী ও Anti Islam নীতি।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ রাহ.কে খলীফা ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করেছিল যে, أيحاسب الخليفة খলীফারা যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের কি হিসাব দিতে হবে? পাকড়াও হবে?

আবু যুরআ রাহ. বলেছিলেন, অবশ্যই হিসাব নেওয়া হবে এবং দলিল হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

অর্থ : হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। কেননা এটি তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।[-সূরা ছোয়াদ : ২৬]

ইবনে কাসীর রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন-

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل

অর্থ : এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাসকদের প্রতি নির্দেশনা যে, তারা যেন লোকদের মধ্যে সুবিচার করে।

বিচার একমাত্র আল্লাহর আইনেই হওয়া বাধ্যতামূলক। ধর্মনিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ ভাব-ভঙ্গি বলতে কিছু নেই।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন ও হিফাজত করুন,আমীন।

মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্য সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ -

মুসলিমদের দ্বীন বিকৃত করার নিমিত্তে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেমন:

১. দুর্বল প্রকৃতি ও দোদুল্যমান ঈমানদার লোকদেরকে সম্পদ ও পদের প্রলোভন দেওয়া, অথবা নারীর টোপ দেওয়া, যেন তারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ও শ্লোগান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ও প্রচার করতে পারে। অবশ্য তার পূর্বেই তারা তাদের প্রতারণার শিকার লোকদেরকে বিভিন্ন মিডিয়ায়, যেগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে,

সেগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরে যেন মানুষ তাদেরকে আলেম, চিন্তাবিদ ও প্রচুর জান্তা হিসেবে জানে এবং সাধারণ লোকদের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তাদের দ্বারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করায়, এভাবে তারা অনেক মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

২. কতিপয় লোককে তারা পাশ্চাত্য দেশে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদীদের আশ্রমে লালন করে এবং তাদেরকে একাডেমিক বিভিন্ন নামী-দামী পদবি প্রদান করে, যেমন 'ডক্টরেট' অথবা 'প্রফেসর' ইত্যাদি। অতঃপর সেখান থেকে প্রর্ত্যাবর্তন করার পর দ্বীনকে বিকৃত ও ভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাদের অস্তিত্ব কতটুকুন ক্ষতিকর; অথচ তারাই সুশীল নামে খ্যাত, স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাদের হাতেই ন্যাস্ত।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের অপর একটি কূটকৌশল হচ্ছে, দ্বীন বা ধর্মকে বিভক্ত করা, তার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমালোচনা ও লেখা-লেখি করা এবং মানুষদেরকে তাতে ব্যস্ত রাখা। এ লক্ষ্যে তারা দীনি ছাত্র, ধর্মীয় আলেম ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদের সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়, যেন তারা মানুষদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপদেশ-নসিহত প্রদানের পরিবর্তে তর্কে ব্যস্ত থাকে।

৪. দীনি আলেম, ধর্মীয় ছাত্র ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদেরকে রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন মিডিয়ায় পশ্চাৎগামী, চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হিসেবে উপস্থাপন করা। আরো প্রচার করা যে, তারা পদ, সম্পদ ও নারী লোভী, যেন মানুষেরা তাদের কথায় বিশ্বাস না করে ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ময়দান উন্মুক্ত হয়।

৫. বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও আলেমদের ইখতিলাফ নিয়ে বেশী আলোচনা করা, যেন মানুষ জানে দ্বীন মতবিরোধের স্থান এবং দীনি আলেমদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই। এভাবে মানুষ বিশ্বাস করতে শিখবে যে, দ্বীনের কোনো বিষয় অকাট্য ও চূড়ান্ত নয়, অন্যথায় এতো বিরোধ সংগঠিত হত না। সেকুলারিজমের অনুসারীরা এ দিকটার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার কুপ্রভাব ছড়ানোর লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়কে তারা বড় আকারে পেশ করে, যার অর্থ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখা।

৬. পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি ও অপরিচিত কালচার সেন্টার নির্মাণ করা। এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম দেশে নির্মিত হলেও পরিচালিত হয় প্রকৃতপক্ষে সেকুলার রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। ইসলামের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক দুর্বল করার লক্ষ্যে তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। একই সাথে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাষ্প ছড়ানোর কাজও

করে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সামাজিক, দার্শনিক ও মনোবিদ্যা বিভাগে তাদের পদচারণা ও প্রচারণা খুব বেশী।

৭. শরীয়তের কতক বিধান, যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে, তার উপর স্থানকাল-পাত্র ও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে জমে থাকা। এভাবে তারা শরীয়তের ভুল ও বিকৃত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা তার অধিকাংশ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।

উদাহরণত শরীয়তের একটি নীতি রয়েছে: 'মাসালেহে মুরসালাহ' (জনস্বার্থ), এ নীতিকে তারা উল্টোভাবে বুঝে ও ভুল পথে প্রয়োগ করে, অতঃপর তার দোহাই দিয়ে ইসলামের যে অংশ তারা পছন্দ করে না তা প্রত্যাখ্যান করে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে, যেকারণে মুসলিম দেশে ধীরেধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী ও তার ভিত্তিসমূহ মজবুত হচ্ছে।

অনুরূপ শরীয়তের আর একটি নীতি রয়েছে: **"দু'টি ক্ষতিকর বস্তু থেকে কম ক্ষতিকর বস্তু ও দু'টি ফেতনা থেকে ছোট ফেতনাকে গ্রহণ কর"**। আরেকটি নীতি রয়েছে: **"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও বৈধতা প্রদান করে"**। আরেকটি নীতি রয়েছে: **"ফায়দা হাসিল করার চেয়ে ক্ষতি দূর করাই অধিক শ্রেয়"**। অনুরূপ একটি নীতি হচ্ছে: **"ইসলাম সর্বযুগে উপযোগী"**। আরেকটি নীতি রয়েছে: **"অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে ফতোয়া ভিন্ন হয়"**। এ জাতীয় নীতিকে তারা গলদভাবে প্রয়োগ করে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে ও মুসলিমদের ধোঁকা দেয়।

অনুরূপ এসব নীতিকে তারা কাফেরদের দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধান, রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনকে মুসলিম দেশে আমদানি করার হাতিয়ার হিসেবে গলদভাবে প্রয়োগ করে, যেন অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অবস্থা না জেনে বদ্দীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার দৃষ্টিতে তাদের এ কৌশল সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর, কারণ এতে মানুষ সন্দেহ ও ধোঁকায় পতিত হয়, তারা ভাবে এসব তো শরয়ীতের নীতি ও ইসলামের নিকট স্বীকৃত। তাদের এ কৌশলের মুখোশ উন্মোচনের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব প্রয়োজন, তবেই দ্বীন থেকে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হবে এবং মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝানো যাবে।

এখানে স্পষ্ট করতে চাই যে, এ জাতীয় নীতির উপর তাদের ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, তারা ইসলামের এসব নীতিতে বিশ্বাসী। আবার এ অর্থও নয় যে, যে-উৎস থেকে এসব বিধান এসেছে, সে ইসলামের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার উপর তাদের ঈমান রয়েছে, বরং এসব তাদের একটি বাহানা, এভাবে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও ভ্রান্ত মতবাদ বাস্তবায়ন করতে চায়।

সেকুলার মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি কি কাফের গণ্য হবে?

সেকুলার মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি কাফের গণ্য হবে কি না-এতে যাওয়ার আগে কিছু মৌলিক বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে দ্বীনকে পৃথক করে দেয় এবং আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে। অথচ একজন মুসলিম যে কালিমায় মুসলিম হয়, তা হলো কালিমাতুত-তাওহীদ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ — আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

এর দাবি হলো: তাগুত, শিরক ও কুফরকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য ও শারীয়াহ মেনে চলা।

অন্যদিকে সেকুলারিজমের গঠনতন্ত্র—

1.আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে মানবীয় আকল ও নফসকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বানানো।

2.আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার না করে মানব-রচিত সংবিধানকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করা।

এগুলো স্পষ্ট কুফর, কারণ মানবীয় বিধানকে আল্লাহর হুকুমের ওপরে স্থান দেওয়া মানে তাগুতকে প্রভু বানানো। তাই সেকুলারিজম একটি জাহিলি, তাগুতী মতবাদ-যা কোনো মুমিন ব্যাক্তির আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। যে কেউ এটি কামনা করে, সে তাগুতকে কামনা করে, আর তাগুতকে গ্রহণকারী ব্যাক্তি কখনো মুমিন থাকতে পারে না।

আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে না,তারাই কাফির। [সূরা মায়িদা-৪৪]

অনেকে সেকুলারিজমের কুফুরি নিয়ে সন্দেহে থাকেন। এ সন্দেহের মূল কারণ ইসলামি শিক্ষার অভাব ও পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব; নয়তো লা ইলাহাহ ইল্লাল্লাহর সাথে স্পষ্ট বিরোধ থাকার পরও সেকুলারিজমের কুফুরি নিয়ে সন্দেহ থাকার কথা না। তবুও যারা এ নিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ে রয়েছেন, তাদের বলবো,আপনি ইসলামি দাওয়াতের ইতিহাস দেখুন, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে মুসলিমদের ইতিহাস দেখুন। কোরআনুল কারীমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, রাসুল ﷺ এর সুন্নাহর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করুন,সব জায়গাতেই আপনি এ ধরনের সন্দেহের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাবেন; সর্বত্রই ইমান-কুফরের লড়াই, কুফর ও শিরকের বাস্তব চিত্র দেখতে পাবেন। এখানে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কি এতো কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করেছেন, এতো যুদ্ধ ও জিহাদ করেছেন এই জন্য যে ,কিছু মানুষ শুধু মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আর এতেই সব শেষ? এরপর তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছেড়ে সেকুলারিজমের আহ্বানে তাগুতের সংবিধান অনুযায়ী বিচার ও শাসন করবে? এজন্যেই কি কোরআনের প্রতিটি সূরা নাজিল হয়েছিল,যাতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন নয়, বরং মানুষ-রচিত বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়?

একটু লক্ষ্য করুন!কুরাইশরা বলেছিল: "হে মুহাম্মাদ, আপনি এক বছর আমাদের মূর্তির পূজা করবেন, পরের বছর আমরা আপনার রবের ইবাদত করবো।"

আর সেকুলারিস্টরা বলে: "তোমরা মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করবে, কিন্তু মসজিদের বাইরে জীবনের সব ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ও আইন প্রণেতা কমিটির তৈরি বিধান মানবে।"

বলুন, উভয়ের এই দুই কথার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আদৌ কোনো পার্থক্য আছে?

বস্তুত,উভয়ের মধ্যে প্রকৃত কোনো পার্থক্য নেই।

এবার আসি মূল প্রশ্নে—

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এখন অন্তত এটা স্পষ্ট যে, যারা মুখে শাহাদাত (কালিমা) উচ্চারণ করে, আপাতভাবে নিজেদের মুসলিম দাবি করে কিন্তু সেকুলারিজমকে বিশ্বাস করে, সমর্থন করে, এর প্রচার চালায় এবং মতাদর্শিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করে,তারা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের মূল দাবিকেই অস্বীকার করে। কারণ সেকুলারিজম আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে মানব-রচিত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা তাগুতের আনুগত্য এবং স্পষ্ট কুফর।

সুতরাং যারা সেকুলার মতবাদে ঈমান রাখে এবং তা মেনে চলে,তারা কাফিরের অন্তর্ভুক্ত, এবং তাদের ওপর কাফিরের হুকুমই বর্তাবে।

আলিমরা এব্যাপারে একমত যে, যে কেউ সেক্যুলারিজমকে আঁকড়ে ধরে রাখে সে কাফির। কারন এই মতবাদ কুফর ও নাস্তিক্যবাদের অনুমোদন দেয়, এবং এতে নাস্তিকদের জন্য মুওয়ালাতকে বৈধ করা হয়, এবং 'ইচ্ছা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা'র নামে তাদের কুফরির প্রসার ঘটাতে দেয় এবং তাদের কাছে এসবকিছুই প্রশংসনীয়। কারন ধর্মনিরপেক্ষতবাদীরা দাবি করে যতো বেশি যতো ধরনের মত, আকিদা ও কুফরের প্রসার হবে ততোই তা মানবজাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিচায়ক হবে। আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করুন।

একইভাবে তারা আরো বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ তা'আলার আইনকে প্রতিহত করে, একে সরিয়ে দিয়ে সেখানে গণতন্ত্রকে আনা এক মহান কাজ। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হল এমন একটি মতবাদ যা মানুষকে রব ও আইনপ্রণেতা (হাকিম) এর আসনে বসায়, তাকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীয়াহ্ বাতিলের এবং এর স্থলে অন্য আইন প্রনয়ন ও

প্রতিস্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। সেকুলারিজমের মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তি ও খাহেশাতকে রব ও নিজের চিন্তাকে মালিক বানিয়ে নেয়। সেকুলারিজম অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের বদলে আনুগত্য করতে হবে মানবীয় প্রবৃত্তি, খাহেশাত ও চিন্তার। এ আনুগত্য হতে হবে সম্পূর্ণ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চেয়েও এই আনুগত্য প্রাধান্য পাবে।

যে কেউ এসকল কুফরি মতাদর্শের ওপর ইমান আনবে, যা কিনা দ্ব্যর্থহীনভাবে ইসলাম বিনস্টকারী বিশ্বাস, তারা কাফির – এমনকি যদিও তারা শাহাদাতের বাণীসমূহ উচ্চারণ করে। এই মৌখিক উচ্চারণ তাদের সামান্যতম উপকারেও আসবে না। তবে ঐ ব্যক্তির উপর তাকফির করা উচিত হবে না, যার কুফরিসমূহ এখনো কিছুটা লুকায়িত আছে, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হুজ্জাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাকে কাফির ঘোষণা দেবার প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হয়ে যায়।

এটি সুবিদিত যে, যখন কারো কাছ থেকে ইসলামকে বাতিলকারী/বিনষ্টকারী কোন সুস্পষ্ট বিষয় প্রকাশিত হয় তখন তার উপর কুফরের হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে কোন শর্ত নেই।

যেমন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কিংবা আল্লাহ্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবমাননা, কিংবা আল্লাহ্র দ্বীনের অবমাননা, কিংবা একাধিক ইলাহতে বিশ্বাস বা ওয়াহদাতুল ওজুদে বিশ্বাস, এবং এধরণের ইসলাম বাতিলকারী বিষয়সমূহ যা ইসলামের মূলের সাথে স্পষ্টভাবেই সাংঘর্ষিক হবার ব্যাপারটি গোপন না – এমন কাজ করা ব্যাক্তির উপর কুফরের হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি উক্ত কাজকে কুফর হিসাবে জানে কি না বা কোন বা তাকফিরের অন্যান্য প্রতিবন্ধকের কোন শর্ত নেই। বরং এই শর্ত (কুফরকারীর এটা জানা যে সে যা করছে তা কুফর) কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের বেলায় প্রযোজ্য। আর এসব এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হচ্ছে সে মুখে ইমানের সাক্ষ্যদ্বয় দেয়ার পর ঈমান বিনষ্টকারী কোন কাজ করে।

আর অন্যদের বেলায়, যারা শাহাদাত উচচারন করেনি, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ্ কিংবা কুরআন পৌঁছে যাক কিংবা না পৌঁছাক, দুনিয়ার ফায়সালা অনুযায়ী তারা কাফির। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইন্টারফেইথ:সেকুলারিজমের ধর্মীয় সংস্করণ -

বর্তমান পৃথিবীতে "ধর্মীয় সম্প্রীতি" বা Interfaith Dialogue কথাটি এমনভাবে প্রচারিত হচ্ছে যেন এটি মানবতার এক মহান শিক্ষা। "Inter" মানে পারস্পরিক, আর "Faith" মানে ধর্ম বা বিশ্বাস অর্থাৎ Interfaith মানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রচেষ্টা। বাহ্যিকভাবে এটি খুব আকর্ষণীয় ও মানবিক মনে হলেও, বাস্তবতা অনেক ভিন্ন। ইন্টারফেইথ-একটা প্রোজেক্ট। এই প্রোজেক্টের স্বতন্ত্র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দর্শন রয়েছে।মুসলিম উম্মাহকে আকীদাগতভাবে দুর্বল করার জন্য আধুনিক যুগের এক সূক্ষ্ম

ষড়যন্ত্রের নামই হচ্ছে ইন্টারফেইথ ফিতনা। এটি এমন এক মতবাদ, যার উদ্দেশ্য মুসলমানদের ঈমান, আত্মপরিচয় ও আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে নরম ও আপসকামী করে তোলা।

"ইন্টারফেইথ ডায়ালগ", "ইন্টারফেইথ হারমোনি", "ইন্টারফেইথ অ্যালায়েন্স"এসব নাম শুনতে যেমন শান্তি ও সম্প্রীতির কথা মনে হয়, আসলে এগুলোর পেছনে কাজ করছে এমন কিছু চিন্তাধারা যেগুলোর লক্ষ্য মুসলমানদের মনে এই ধারণা তৈরি করা যে, সব ধর্মই সমান ও সত্য। অথচ এটি সরাসরি কুরআনের মূল আকীদার বিরোধী।

ইতিহাসে যেমন বাদশাহ আকবর "দ্বীন-ই-ইলাহী" নামে সব ধর্মের মিশ্রণে এক কুফরি ধর্ম তৈরি করতে চেয়েছিল, আজকের "ইন্টারফেইথ" আন্দোলনও তেমনই এক আধুনিক রূপ। যেখানে ইসলামকে অন্য ধর্মের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা-

১. ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন কেবল ইসলামই। - [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯]

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন অনুযায়ী-

'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহপ্রদত্ত ধর্মকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, এ ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করে ও তাঁর যাবতীয় আদেশ শিরোধার্য করে। সে কারণেই এর অনুসারীকে মুসলিম অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী বলে। এমনিতে তো সকল আসমানী ধর্মই ইসলাম। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোকে যেহেতু তাদের অনুসারীগণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি, বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তা বিকৃত করে ফেলেছে, অবশেষে শেষ নবীর আবির্ভাবের পর তার শরীআত দ্বারা সেগুলোর অনেক বিধান রহিতও হয়ে গেছে, তাই সেগুলো আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত থাকেনি। এখন ইসলাম হল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত দীন ও শরীআত, যা এক পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী ধর্ম।

২. ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে মহা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। - [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮৫]

বাস্তবিক অর্থে ইন্টারফেইথ এবং সেক্যুলারিজম একই মতবাদের দুই নাম। পার্থক্য শুধু বাহ্যিক উপস্থাপনায়। সেক্যুলারিজম চালানো হয় দাড়ি-টুপি বিহীন লোকদের মাধ্যমে, আর ইন্টারফেইথ প্রচারিত হচ্ছে ধর্মীয় পোশাকে, বক্তা ও আলেমদের মাধ্যম দিয়ে যেন মুসলিম সমাজের ভিতর থেকেই বিশ্বাসের ভিত্তি নষ্ট করা যায়।

কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও এখন মুসলিম দেশগুলো, বিশেষ করে মাদরাসা ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে "ইন্টারফেইথ শিক্ষা" প্রচলনের চেষ্টা করছে। প্রশিক্ষণের নামে তরুণ প্রজন্মকে এমন এক ভাবনায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে যেখানে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি বিকল্প হিসেবে দেখা হয় আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে নয়।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন বহু সংগঠন কাজ করছে যারা "ইন্টারফেইথ" ধারণাকে প্রচার করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১। Muslim Christian Dialogue Forum (পাকিস্তান)

এই ফোরামটি মূলত পাকিস্তানি রাজনীতিক ও সুফিবাদপন্থী চিন্তাবিদ তাহিরুল কাদরীর নেতৃত্বে পরিচালিত। সংগঠনটি মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সহনশীলতা প্রচারের দাবি করে।

২। Interfaith Encounter Association (IEA) – মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক এ সংগঠনটি "Middle East Abrahamic Forum" নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। তাদের উদ্দেশ্য ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সমাজের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও 'আব্রাহামিক ঐক্য' প্রতিষ্ঠা।

৩। Messiah Foundation International (যুক্তরাজ্য/পাকিস্তান)

রিয়াজ আহমদ গোহার শাহী নামের এক বিতর্কিত ব্যক্তি এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে মাহদি ও মসীহ দাবি করেন। সংগঠনটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত, পাকিস্তানসহ নানা দেশে সক্রিয়।

৪। Project Interfaith (যুক্তরাষ্ট্র)

নেব্রাস্কাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান, যার প্রতিষ্ঠাতা বেথ কাটজ। তারা নানা কর্মশালা, সেমিনার ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলার কাজ করে।

৫। The Insight Film Festival (যুক্তরাজ্য)

এই সংস্থাটি মূলত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 'ধর্মীয় সহনশীলতা' ও 'বহুত্ববাদ' প্রচার করে। তারা বিভিন্ন দেশে ফিল্ম প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে তরুণদের ইন্টারফেইথ ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে।

৬। United Religions Initiative (URI) – যুক্তরাষ্ট্র

এটি বিশ্বের অন্যতম বড় ইন্টারফেইথ নেটওয়ার্ক। বর্তমানে ৮০টিরও বেশি দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে। তাদের লক্ষ্য "সব ধর্মের মানুষ যেন একে অপরকে ভাই-বোন হিসেবে মেনে নেয়।"

৭। Jordanian Interfaith Coexistence Research Center (জর্ডান)

জর্ডান সরকারের আংশিক সহায়তায় পরিচালিত এ কেন্দ্রটি ইসলামী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থান নিয়ে গবেষণা করে এবং নীতিমালা প্রণয়ন করে।

৮। Global Peace Pioneers (GPP) – পাকিস্তান

একটি এনজিও হিসেবে পরিচিত এই সংগঠনটি দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সমাজে 'শান্তি ও ঐক্য'র নামে ইন্টারফেইথ প্রচার করে।

৯। OSIS (Organization for Spiritual Interfaith Studies) – নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটি ভিত্তিক এই সংগঠনটি পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় একাডেমিক বিনিময় ও সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে।

১০। Religions for Peace (RFP) – আন্তর্জাতিক

এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম আন্তঃধর্মীয় সংস্থা। প্রায় ১০০টিরও বেশি দেশে তাদের শাখা রয়েছে। জাতিসংঘ ও বিভিন্ন সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে তারা "ধর্মীয় শান্তি উদ্যোগ" পরিচালনা করে।

১১। International Association for Religious Freedom (IARF) – যুক্তরাজ্য

এই সংস্থা ১৯০০ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে এক ছাতার নিচে এনে "বিশ্বাসের স্বাধীনতা" ও "ধর্মীয় বহুত্ববাদ" প্রচার করে।

১২। Interfaith America (যুক্তরাষ্ট্র)

আগে এর নাম ছিল "Interfaith Youth Core (IFYC)"। এটি তরুণ প্রজন্মকে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে সহযোগিতা ও সহনশীলতার পথে আহ্বান জানায়।

১৩। KAICIID – King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (অস্ট্রিয়া/সৌদি আরব)

সৌদি সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি ভিয়েনায় অবস্থিত। তারা "ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংলাপ" প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী সম্মেলন আয়োজন করে।

২০২২ সালে অস্ট্রিয়ার সরকার ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর চাপে KAICIID তার সদর দপ্তর ভিয়েনা থেকে লিসবন, পর্তুগাল-এ স্থানান্তর করেছে। এখন এটি "KAICIID Global Centre for Dialogue" নামে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

১৪। World Council of Churches (WCC) – সুইজারল্যান্ড

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের একটি বৈশ্বিক জোট, যারা বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সংলাপ ও যৌথ কর্মসূচি পরিচালনা করে "বিশ্বশান্তি" প্রচার করে।

১৫। Parliament of the World's Religions (যুক্তরাষ্ট্র)

এটি সবচেয়ে পুরনো ইন্টারফেইথ প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি, যা ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর লক্ষ্য সব ধর্মকে একত্র করে মানবতার একটি "সাধারণ নৈতিক ভিত্তি" তৈরি করা।

ইসলামের অবস্থান-

ইসলাম মানবিক সহাবস্থান ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়, কিন্তু কখনোই অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে "সত্য" হিসেবে স্বীকার করে না। ইসলামী দৃষ্টিতে শান্তি মানে আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মে আত্মসমর্পণ, অন্য ধর্মের সাথে আপস নয়। তাই মুসলিমদের দায়িত্ব হলো ইন্টারফেইথের বাহ্যিক সৌন্দর্যে বিভ্রান্ত না হয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করা।

শেষ কথা হচ্ছে,ইন্টারফেইথ কোনো নিরীহ সামাজিক উদ্যোগ নয়; এটি আধুনিক যুগের এক বুদ্ধিবৃত্তিক ফিতনা। মুসলিমদের উচিত এই ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা, কারণ একবার আকীদার ভিত দুর্বল হয়ে গেলে ঈমান অটুট রাখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন সব চিন্তা ও আন্দোলন থেকে রক্ষা করুন, যা ইসলামি আকীদা ও তাওহীদের বিরুদ্ধে যায়। আল্লাহ একমাত্র সত্য ইলাহ, ইসলামই তাঁর মনোনীত দ্বীন।

হিউম্যানিজম কী: এটি কি আদৌ নিরপেক্ষ হতে পারে?

সেকুলারিজম মানুষের জীবন থেকে দ্বীনকে রাষ্ট্র, সমাজ ও আইন থেকে সরিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এই সেকুলার কাঠামোর ভিত্তি হলো "হিউম্যানিজম" - যাকে বাংলায় মানববাদ বলা হয়। তবে মানববাদ না বলে 'মানবপূজা' শব্দটাই এই ক্ষেত্রে যথার্থ হয়। হিউম্যানিজম মূলত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার মৌলিক ধারণা। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা ও পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে এই একটা চিন্তার উপর। সেক্যুলাররা তাদের 'হিউম্যানিজম' ধারণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য একটি কমন প্রশ্ন তোলে-'আমাদের আসল পরিচয় মানুষ নাকি মুসলিম!' তাদের নিকট এই প্রশ্নের ব্যাপক এবং প্রচলিত উত্তর হলো, আমাদের আসল পরিচয় 'আমরা মানুষ'। আমাদের নিজেদের প্রথমে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা লাগবে। মুসলিম হিসেবে চিন্তা করলে মাত্র কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে ভাবতে হবে। কিন্তু মানুষের জায়গা থেকে চিন্তা করলে পুরো পৃথিবীর সকলেই এসে যাবে। মূলত এই ধারণার মাধ্যমেই সেক্যুলারিজম ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে। কারণ হিউম্যানিজমকে মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এটাই যৌক্তিক মনে হবে যে সামাজিক জীবনের ভিত্তি এমন কোনো বিষয় হওয়া উচিত, যা সবার জন্যই মূল এবং সবার মাঝেই আছে। যেন একটি সামগ্রিক জীবনাদর্শ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। যদি ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ কায়েম হওয়া সঠিক হয় তা হলে বংশ বর্ণ ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে সমাজ কায়েম হওয়াকেও সঠিক মনে করতে হবে। মানুষের মূল অবস্থান 'ইনসানিয়্যাত' মেনে নিলে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে যায়। এটা এর আবশ্যিক ফল। আর এটাই সমস্ত সেক্যুলার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি (সেটা লিবারেলিজম হোক কিংবা সমাজতন্ত্র)। সেক্যুলারিজম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন জীবনব্যবস্থা, যা ওহির পরিবর্তে মানবীয় বিবেকের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, কোনো কোনো ইসলামি বুদ্ধিজীবী যখন সেক্যুলারদের সাথে কথা বলে তখন তারা হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে কথা বলে। ফলে দেখা যায়, হয়তো তারা আলোচনায় পরাজিত হয়; কিংবা অত্যন্ত দুর্বল এবং ঠুনকো দলিলের আশ্রয় নেয়। হিউম্যানিজমকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত ধর্মকে সামাজিক জীবনে শামিল করার পলিসি বানানো অসম্ভব। আলোচিত প্রশ্ন 'আমরা মানুষ নাকি মুসলমান'-এর সুস্পষ্ট এবং অকাট্য উত্তর হবে 'আমি মুসলমান (আল্লাহর সৃষ্টি ও তার কাছে আত্মসমর্পণকারী অর্থে)'। তা হলে আমি কি মানুষ নই? হ্যাঁ, আমি মানুষও। তবে আমি পশ্চিমা সংজ্ঞায়িত অর্থে মানুষ নই যে, আমি আমারই দাস। মানুষ হওয়া তো একটি সৃষ্টিগত ঘটনা এবং আমার মুসলমানিত্ব প্রকাশের মাধ্যম। আমাদের মূল পরিচয় হলো আমরা গোলাম তথা আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষ

হওয়ার পূর্বের কথা হলো আমরা মাখলুক (সৃষ্টি)। আমাদের একজন স্রষ্টা আছেন। এখন মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি একটি ঘটে যাওয়া বিষয়ের মতো।

বিষয়টি ভালো করে বুঝার জন্য এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে যদি আমরা মানুষ না হতাম তা হলে কী হতাম? এর দুটি সুরত রয়েছে। হয়তো ফেরেশতা হতাম নয়তো কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ হতাম; কিন্তু আমরা যা-ই হই না কেন- সর্বাবস্থায় আমাদের মৌলিকত্ব হলো আমরা মাখলুক। অর্থাৎ অস্তিত্বের সম্ভাব্য প্রতিটি অবস্থাতেই আমাদের মৌলিক অবস্থান একজন আবদ, বান্দা বা গোলামের। এখন আমার গোলামির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে। উদাহরণত, আমি যদি পোকা হই, তা হলে আমার 'আবদিয়্যাত'-এর প্রকাশ পোকার সুরতেই হবে। আবার আমি যদি ফেরেশতা হই তা হলে ফেরেশতার সুরতেই আমার আবদিয়্যাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এবার আমি যদি মানুষ হই তবে এটা আমার আবদিয়্যাত প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। মোটকথা, আমার সুরত তো পরিবর্তন হতে পারে; কিন্তু আমি যদি সৃষ্টি হই তবে আমার অবস্থান সর্বদা মাখলুক, আবদ এবং বান্দাই থাকবে। কোনোক্রমেই এই অবস্থা পরিবর্তনযোগ্য নয়। আমার সকল অবস্থা এই অর্থে নির্ধারিত যে আমার অস্তিত্বের কিছুই আমি নিজে সৃষ্টি করতে পারি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন, আমার কোনো ইচ্ছা ছাড়াই, ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন না।

আমরা অনেকেই মনে করি হিউম্যান রাইটস যৌক্তিক এবং নিরপেক্ষ ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা একটা বিভ্রান্তিকর দাবি।হিউম্যান রাইটস মোটেই নিরপেক্ষ নয়। বরং হিউম্যান রাইটস কল্যাণ-অকল্যাণ, ঠিক-বেঠিক ও ভালো-মন্দের একপেশে ধারণাকে আবশ্যিকভাবে লালন করে। সেক্যুলারগোষ্ঠী ধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে দেখিয়ে মানুষের সমষ্টিগত জীবন থেকে দীনকে সরিয়ে দিতে চায়। যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই সাম্প্রদায়িক হবে, অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র কল্যাণ-অকল্যাণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ও বৈধ-অবৈধ হওয়ার নির্দিষ্ট ধর্মীয় ব্যাখ্যার বাইরে অন্যসব ব্যাখ্যা বাতিল সাব্যস্ত করবে এবং সেগুলোকে দমন ও পরাজিত করবে। সেজন্য ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখতে হবে। আর এমন এক কাঠামোর উপর রাষ্ট্রকে দাঁড় করাতে হবে, যা নিরপেক্ষভাবে কল্যাণের সমস্ত ধারণাকে চর্চা করার সুযোগ তৈরি করে দেবে। আর তা হিউম্যান রাইটস- এর মাধ্যমেই সম্ভব। এসব কুযুক্তি দেখিয়ে তারা মানুষকে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করে।

কিন্তু আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে লিবারেল সেক্যুলার রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ও সহিষ্ণু হওয়ার যে দাবি পশ্চিমা এবং সেক্যুলাররা করে থাকে, তা সম্পূর্ণই মিথ্যা। কারণ, হিউম্যান রাইটসও ভালো-মন্দের নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। আর তা হলো 'ভালো-মন্দের সকল ধারণাই সমান ও সমপর্যায়ের', এটা তো নিজেই একটা পক্ষ।*-(১)যে নিজেই একটি

পক্ষ, সে আবার নিরপেক্ষ হয় কী করে? হিউম্যান রাইটস- এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নির্দিষ্ট এই ধারণা সংরক্ষণ করে। এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে। প্রচলিত হিউম্যান রাইটসকে মেনে নেওয়ার অর্থ হলো 'ইসলামই একমাত্র সত্য'- এই মহাসত্য অস্বীকার করা। হিউম্যান রাইটসের প্রকাশ্য ঘোষণা হচ্ছে- 'সব ধর্ম ও মতবাদই ইসলামের মতো সত্য'। সম্ভাব্য কয়েকটি সত্যের মাঝে ইসলামও একটি। এর বাইরে আরো সত্য রয়েছে।

-

[(১)-মূলত পাশ্চাত্যের কাছে 'কল্যাণ'-এর প্রতিষ্ঠিত কোনো ধারণা নেই। তারা যেই স্বাধীনতাকে কল্যাণ হিসেবে মেনে নিয়েছে, তা কল্যাণের ধারণাশূন্য একটা দাবি। absence of any good. এখানে কল্যাণের নির্দিষ্ট কোনো কাম্য বিষয় নেই। তাদের কাছে যেকোনো কিছু কামনা করার অধিকারই আসল কল্যাণ। বলা যায় কল্যাণহীনতাই তাদের কাছে সর্বোচ্চ কল্যাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। (ইসলামি ব্যাংকারি আওর জমহুরিয়্যত, জাহিদ সিদ্দিক মোগল, ২৩০)]

-

কোনো লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেবল ভালো-মন্দের সেসব ধারণাই মেনে নেয়, যা তার সুনির্দিষ্ট ধারণার পরিপন্থি না হয়। কল্যাণের যে ধারণাই হিউম্যান রাইটস-এর সাথে সাংঘর্ষিক হবে কিংবা যারাই কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে একমাত্র সত্য মনে করে অন্যান্য সবকিছুকে বিলুপ্ত ও পরাজিত করার পরিকল্পনা করবে, তাদেরকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হবে। সুতরাং হিউম্যান রাইটস ঐ ধারণা বা আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে, যা হিউম্যান রাইটস-এর আদর্শ মেনে নেয় না। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা তাদের একটি বুলি মাত্র।

আবার কোনো জনপদের লোকেরা যদি প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমের মাধ্যমেই ধর্মীয় বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র চালাতে চায়, তা হলে হিউম্যান রাইটস তাকেও মেনে নেবে না।*(২) কারণ হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষের মৌলিক অধিকার হলো স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতিকে মেনে নিয়ে পাশ্চাত্যের গোলামি করা। এখন কেউ যদি এগুলো অস্বীকার করে দীনের গোলামি করে, আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয় তা হলে সে যেন তার মৌলিক অধিকার প্রত্যাখ্যান করল। তখন সে আর 'হিউম্যান' থাকে না। ফলে তাকে মেরে ফেলাও বৈধ।*- (৩) এটাই হলো হিউম্যান রাইটস-এর নিরপেক্ষতা।

-

[(২)- গণতান্ত্রিকভাবে নিরঙ্কুশ বিজয়ের দ্বারা আলজেরিয়ায় 'আন-নাহদা' এবং মিশরের 'মুসলিম ব্রাদারহুড' সরকার গঠন করেছিল, যাদেরকে উৎখাত করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

(৩)- পশ্চিমা কর্তৃক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আজকের দুনিয়ার কোটি মুসলিম হত্যার পেছনের যুক্তি ও দলিল এটাই।]

-

এমনিভাবে যদি একজন মুসলিম নারী কোনো কাফের পুরুষকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে নিশ্চিতভাবেই ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে এই কাজের অনুমোদন দেবে না। কিন্তু যেহেতু হিউম্যান রাইটস-এর দৃষ্টিতে এটা ব্যক্তির অধিকার, তাই তাকে আইনি অনুমোদন এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। যদি মুসলিমসমাজ উক্ত নারীর উপর নিজেদের বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে চায়, তা হলে লিবারেল রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী কল্যাণের সংজ্ঞা পরিবর্তিত ও বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কল্যাণের সংজ্ঞা এভাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না যে এটাই একমাত্র কল্যাণ। লিবারেল সেক্যুলার রাষ্ট্রে যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে, তবে হিউম্যান রাইটসের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু করা যাবে না। যেমন: ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকার। আর ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এখন কেউ যদি এই কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করে, তা হলে সেক্যুলার রাষ্ট্র তাকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করবে। কারণ এটা তাদের স্বাধীনতা-নীতির বিরুদ্ধে যায়।

যেকেউ কল্যাণের ধারণাকে একটি অধিকার হিসেবে চর্চা করতে পারবে; কিন্তু সেই ধারণাকেই একমাত্র কল্যাণ কিংবা অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাকে অন্যান্য কল্যাণের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাও করতে পারবে না। ব্যক্তির এমন চাহিদাকে আইনগতভাবে এবং নৈতিকভাবে অবৈধ ও অগ্রাহ্য করা হবে, যা হিউম্যান রাইটস-এর বিরুদ্ধে যায়। তার প্রাণনাশকে বৈধ ঘোষণা করা হবে। সুতরাং বুঝা গেল লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। বরং তা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মতোই সাম্প্রদায়িক, Dogmatic এবং intolerant. কারণ উভয় প্রকার রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব কল্যাণের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয় না। এজন্যই বিখ্যাত লিবারেল চিন্তাবিদ Rawls বলেছে, 'ধর্মীয় স্বাধীনতাকে কখনোই লিবারেলিজমের জন্য আশংকাজনক হয়ে উঠতে দেওয়া যাবে না। লিবারেল স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির ভালো-মন্দ নির্ধারণের অধিকারকে অস্বীকার করে এমন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দমন করা মহামারিকে রোধ করার মতোই জরুরি।*(৪)

সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে, কল্যাণের সমস্ত ধারণা সমপর্যায়ের মেনে নেওয়া কোনো নিরপেক্ষতা নয়; বরং এটাও একটা পক্ষপাতমূলক মূলনীতি মেনে নেওয়া। আর সেই মূলনীতি হলো, সত্য-মিথ্যা ও ভালো- মন্দের সকল ধারণা মেনে নেওয়া। নির্দিষ্ট কোনো ধারণাকে

একমাত্র সত্য না মানা। এটাও একধরনের পক্ষপাতমূলক অবস্থান। এখানে নিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই।*(৫)

-

[(৪)-theory of justice
(৫)-প্রাগুক্ত-১৯৯,২০১]

সেক্যুলারিস্ট মুসলিম

এর মানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম।সেক্যুলারিস্ট মুসলিমরা মূলত মুসলিমই নয়। কারণ, তারা ইসলামকে কেবল ব্যক্তি-জীবনে পালনীয় ধর্ম মনে করে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা মনে করে। এদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে ধর্মের বলয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। রলস-এর ভাষায় এরাই হলো লিবারেলিস্ট।*-(১)

এমন সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী নীতি অনেক পশ্চিমা দার্শনিকের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। যেমন রুশো বলেছেন,*-(২)'পৃথিবীর যে সৃষ্টিই পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবনধারা অস্বীকার করে, সে নিজেকে মানুষ দাবি করার যোগ্য থাকে না। নফসপূজারি না হওয়াই একজন মানুষের পাগল হওয়ার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এই সভ্য সমাজে এমন সন্ত্রাসীদের বিহিত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমেই করতে হবে আমাদের সভ্যতার জন্য তাদের হুমকি হয়ে ওঠার আগেই। আর যদি কোথাও পুরো সমাজই এমন সন্ত্রাসী হয়ে যায় (যেমন তালেবান) তা হলে যেসব সভ্য সমাজ আমাদের নীতি মেনে নিয়েছে, তাদেরকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসী সমাজের বিরুদ্ধে মিশনের বৈধতা দেওয়া হবে। এমন অসভ্য, জঙ্গি লোকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে, যেন বাকি মানব-সমাজ 'হিউম্যান' হয়ে জীবনযাপন করতে পারে।' *-(৩)

-

[(১)- মুসলিমদের সাথে পাশ্চাত্যের আচরণবিধি প্রসঙ্গে এখানে র‍্যান্ডের প্রতিবেদনগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এটা স্পষ্ট করা যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কতটা সাম্প্রদায়িক। তবে আমাদের জন্য এই রিপোর্টগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামকে বিকৃত ও পাশ্চাত্যকরণের পিছনে তাদের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে জানা ও বুঝা। এর পিছনে কারা, কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের কাজের পদ্ধতিগুলো ইসলামের সাথে কেন সাংঘর্ষিক- এই বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। আমরা দোয়া করব আল্লাহ উম্মাহর এই প্রয়োজন পূরণ করে, দেবেন ইনশাআল্লাহ।

(২)-রুশোর বক্তব্যে সরাসরি পাশ্চাত্য সমাজের কথা উল্লেখ নেই। সে খায়েশ পূরণের জন্য গঠিত সামাজিক কাঠামোর কথা বলেছে। আর এটাই পাশ্চত্য সমাজব্যবস্থার মূল উপাদান।

(৩)cole, Cameroon and Edward [1983], p.105

-

বিভিন্ন সময় আমাদের মুসলিম ভাইদের গ্রেফতার দেখানো হয়। তাদের অপরাধ হিসেবে দেখানো হয়, তারা গণতন্ত্র কিংবা সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী নয়। এগুলোকে তারা কুফুরি ব্যবস্থা মনে করে। এই অপরাধের কারণেই একটা সেক্যুলার রাষ্ট্র তাদের বসবাসের অধিকার কেড়ে নেয়। কারণ তাদের ল' অনুযায়ী এরা পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য চরম হুমকি। এজন্যই পশ্চিমাবিশ্ব এদেরকে চরমপন্থি হিসেবে আখ্যায়িত করে; অথচ কোনো মুসলিমই এসব মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না।

ইসলামি ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেকুলার ভাবধারার বৈধতা খোঁজা-

সেক্যুলারিজমকে যারা ধর্মীয় পোশাক পরাতে চায়, তারা তাদের এই জঘন্য কর্মের পেছনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকে মদিনা সনদকে। 'মদিনা সনদ'কে সামনে রেখে তারা মানুষকে দেখাতে চায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। যে রাসুলকে প্রেরণই করা হয়েছে ইসলামকে সমস্ত ধর্ম, মতবাদ ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করে সকল বাতিল ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, তার ব্যাপারে এমন দাবি করা যে জঘন্য অপবাদ- তা একজন চিন্তাশীল সাধারণ মুসলিমেরও বুঝে আসার কথা। উপর্যুক্ত দাবি এতটাই অনর্থক যে, এটাকে খণ্ডন করা কেবল সময় নষ্ট করা হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের এতটাই অধঃপতন হয়েছে যে, বর্তমান বাস্তবতায় মুসলমানরা উপর্যুক্ত দাবিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। তাই কালের বিবর্তনে সেই সময় নষ্ট-করা কাজটিই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখানে একেবারে সংক্ষেপে মদিনা সনদের ব্যাপারে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরব।

এক. ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সালাফদের কেউই ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে মদিনা সনদের টার্ম ব্যবহার করেননি এবং কেউই মদিনা সনদকে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সাব্যস্ত করেননি। রাসুল ﷺ থেকে শুরু করে সাহাবিদের যুগ পেরিয়ে ইমাম-সালাফদের কারো কাছ থেকেই এটা প্রমাণিত নয়।

দুই. মদিনা সনদ কেবল একটি প্রতিরক্ষামূলক অঙ্গীকারনামা, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক অবস্থায় শত্রু না বাড়িয়ে বরং এক শত্রুর বিরুদ্ধে আরেক শত্রুকে ব্যবহার করা। আর কোনো অঙ্গীকারনামা কখনোই মৌলিক ভিত্তি হতে পারে না। কারণ অঙ্গীকারনামা অস্তিত্বে আসেই একটা সাময়িক এবং আপাত-পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে, যা চূড়ান্ত কিছু হয় না। যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তির কথাই ধরা যাক। সেখানে চুক্তির একটি বিষয় ছিল কোনো কাফের মুসলমান হয়ে রাসুলের কাছে চলে এলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। এটা ছিল সাময়িক সিদ্ধান্ত। মৌলিকভাবে ইসলাম কখনোই এটা সমর্থন করে না।

তিন. মদিনা সনদ কেন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে না এর সবচেয়ে বড় সত্য উত্তর হলো, ইসলামি শরিয়ত তখনো অপূর্ণাঙ্গ ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অনেক বিধান এসেছে, যা মদিনা সনদে ছিল না। এমনকি তখন জিজিয়ার *-(১) বিধানও ছিল না। ফলে মদিনা সনদ চূড়ান্ত এবং অকাট্য কোনো বিষয়ের মধ্যে পড়ে না যে, কেবল এর ভিত্তিতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

-

[(১)-জিজিয়া হলো ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের (যিম্মি) উপর ধার্যকৃত একটি বার্ষিক কর]

-

চার. সর্বশেষ বিষয় হলো, কেউ যদি মদিনা সনদের ধারাগুলো ভালোভাবে লক্ষ করে তবে সেখানে সে কোনোভাবেই সেক্যুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পাবে না। কারণ মদিনা সনদের অন্যতম প্রধান ধারাই হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া। এই ধারাটি এতটাই সামগ্রিক যে মদিনা সনদের পরে আসা শরিয়তের সমস্ত বিধান শামিল করে নেয় এবং এই ধারার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়াই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি; মদিনা সনদ নয়।

এ ছাড়াও কেউ কেউ সেক্যুলারিজমকে তার পারিভাষিক রূপ থেকে বের করে এর ইসলামি সংজ্ঞা দাঁড় করাতে চায়। এখানে কিছু সমস্যা আছে।

প্রথমত বিজাতীয় যেকোনো পরিভাষাকে ইসলামিকরণ করা শরিয়ত- সমর্থিত নয়।

ধরুন আমরা সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যা আবিষ্কারের চেষ্টা করছি। আর সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি আমরাও সেক্যুলারিজমকে আদর্শিকভাবে বিশ্বাস করি। এখানে সূক্ষ্ম পয়েন্ট হলো, আমরা আদর্শিকভাবে সেক্যুলারিজমকে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের মানদণ্ড হিসেবে মেনে নিচ্ছি। এখানে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, সেক্যুলারিজম ফোকাসিং হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ইসলামই যে একমাত্র মানদণ্ড, কুরআন-সুন্নাহই একমাত্র সত্য বাকি সব মিথ্যা, শরিয়তই একমাত্র নৈতিকতা এবং আদল- নিজেদের এই মানদণ্ড এবং দাবির জায়গায় আমরা দুর্বল হয়ে পড়ছি। এটা প্রথম সমস্যা যে আমরা মানদণ্ডের জায়গাতেই হেরে যাচ্ছি। আর বিশ্বব্যাপী তাদের মানদণ্ডই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাদের মানদণ্ডকে মেনে নিয়ে নানান ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে চাচ্ছি। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নানা ব্যাখ্যা আওড়িয়ে বলেননি যে ইসলামেও কুফর আছে। কুফর কুফরই, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

এর আরেক সমস্যা হলো, মানুষকে আমরা লুকোচুরির মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাচ্ছি যে, আমরাও সেক্যুলারিজমের চর্চাকারী। এটা কখনো মানুষকে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য নৈতিক কিংবা আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করবে না। দিনে দিনে তাদের মনে সেক্যুলারিজম নামক মানদণ্ড

প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া বলয় দিন দিন মূলধারার সেক্যুলারিজমেই ফিরে যাবে। ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোব বাস্তবতা বিষয়টি আরো শক্তভাবে প্রমাণ করছে। বিভিন্ন দেশের নানা ইসলামি গণতান্ত্রিক দল ইসলামি ভাবধারা ও গঠনতন্ত্র বাদ দিয়ে ক্রমে ক্রমে আরও সেক্যুলার হয়েছে এবং হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত সেক্যুলারিজমের ইসলামি ব্যাখ্যাকাররা এর ইসলামি কাঠামোও দেখাতে পারছে না। সেক্যুলারিজমের যে কাঠামো তারা দেখানোর চেষ্টা করে, তা আসলে ইসলামসমর্থিত কাঠামো নয়। তারা সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাগত দিকটাই ইসলামি হিসেবে দেখাতে চায় (আর এজন্যই তারা এরদোগানের তুরস্ককে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ এরদোগানের দেশেও যেই সেক্যুলারিজমের চর্চা হয়, তা কখনোই ইসলামসমর্থিত নয়)। যেমন, যদি কেউ বলে সেক্যুলারিজমের মানে হলো সকল ধর্ম ও মতের প্রতি উদার এবং নিরপেক্ষ হওয়া, তা হলে তার এই দাবি ভুল। কারণ সেক্যুলারিজমের এই কাঠামোকেও ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্ম ও মতকে সমান অধিকার দেয় না। যেমন, সেক্যুলারিজম তার বাইরের কোনো মতকে সহ্যই করে না। (ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)

তৃতীয়ত, তারা যাকে সেক্যুলারিজম বলছে, তা আসলে সেক্যুলারিজম নয়। যেমন, ট্রাফিক আইন*-(২) কিংবা বর্তমান সময়ের নতুন কোনো বিষয়ের আইনকে ইসলামি শরিয়ত সেক্যুলারিজম বলে না। ইসলামে এটাকে কিয়াস কিংবা ইজতিহাদ বলে। সেক্যুলারিজমকে ইসলামিকরণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি উপেক্ষিত হয়, তা হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাত হলো রাষ্ট্রে ফয়সালা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র ভিত্তি আল্লাহর শরিয়াহ হওয়া।

الحكم بما أنزل الله

(আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা রায়) প্রদানের চর্চা থাকা। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিই হচ্ছে এই হাকিমিয়্যাত। দারুল ইসলাম কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় সালাফরা যে বিষয়টি মুখ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তা হলো ইসলামি শরিয়াহ বিজয়ী হওয়া। ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকা। এ কারণেই ইসলামি ইমামাতের বাইয়াতই সংঘটিত হয় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের উপর। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আল্লামা মাওয়ারদি রহিমাহুল্লাহর 'আহকামে সুলতানিয়া' দেখা যেতে পারে।

-

[(২)-যদিও ফিকহের কিতাবে ট্রাফিক আইন নামে কোনো অধ্যায় নেই; কিন্তু শরিয়তের মৌলিক উসুলের ভিত্তিতে এসব বিষয়ে নানা নির্দেশনা ঠিক করা যেতে পারে। যেমন- নারী ট্রাকিফ নিয়োগ দেওয়া যাবে কি না, একজন ট্রাফিকের শ্রম ও ভাতা কত হবে, গাড়ি ডানে

চলবে নাকি বামে ইত্যাদি। তা ছাড়া শরিয়তকর্তৃক ঘোষিত যেকোনো মুবাহ (বৈধ) বিষয় শরিয়তেরই অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা নিয়ে পৃথক আলোচনা না থাকে।

সুতরাং ব্যভিচারের অনুমোদন না দেওয়া, সুদের প্রচলনের সুযোগ না দেওয়া, জিম্মিদের থেকে ট্যাক্স নেওয়া, হুদুদ বাস্তবায়ন করা- এসব হাকিমিয়্যাতেরই অংশ। মুসলিমদের ব্যাপারে যে আদেশ-নিষেধ আছে, তা বাস্তবায়ন করা এবং অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রে যে নির্দেশনা রয়েছে, তা প্রয়োগ করাও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে অমুসলিমরা কোনো চুক্তি ভঙ্গ করলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও হাকিমিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। আবার নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করাটাও হাকিমিয়্যাহর আওতাভুক্ত। মোটকথা, ইসলামি শরিয়াহ ও আহকামকে বিচারকের মর্যাদা দেওয়া হলো হাকিমিয়্যাহ, যা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার রাসুলকেই বিচারক মানা। তাওহিদুল হাকিমিয়্যাতকে না বুঝার কারণে তারা দুইভাবে ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

এক. মুজতাহিদদের কর্ম ও সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নকে গুলিয়ে ফেলা। মুজতাহিদদের কাজ হলো কুরআন-সুন্নাহর প্রিন্সিপাল অনুযায়ী নতুন কোনো বিষয়ের শরয়ি হুকুম বের করা। তাদের কাজের ভিত্তি থাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের বুঝ ও ব্যাখ্যা। সালাফদের বুঝকে পুঁজি করেই তারা ইজতিহাদ করেন। তারা নতুন নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন না এই ক্ষেত্রে। যারাই সালাফদের বুঝের বাইরে নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাইবে, তারাই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্য দিকে সেক্যুলারদের আইনের ভিত্তি থাকে মানবীয় প্রবৃত্তি ও বিবেক। তারা আল্লাহর হাকিমিয়্যাত প্রত্যাখ্যান করে, যাকে মহান আল্লাহ জাহিলিয়্যাতের হুকুম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।*(৩) সুতরাং মুজতাহিদদের কর্ম এবং সেক্যুলারদের আইনপ্রণয়নের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের মাঝে বরং তাওহিদ ও শিরকের সম্পর্ক। একটি ঈমান, অপরটি কুফর।

দুই. ইসলামি শরিয়তকে অপূর্ণাঙ্গ এবং অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখানো। এমন দাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দেওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক।*(৪) আমরা জানি আমাদের দীন কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য পালনীয় একমাত্র দীন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই ইসলামি শরিয়তে মানবজাতির পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সমাধান ও নির্দেশনা পূর্ণরূপে থাকবে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

-

[(৩)সুরা মায়িদা, আয়াত ৫০

(৪)সুরা মায়িদা, আয়াত ৩]

-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার কাছে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক জিনিসের সুস্পষ্ট বিবরণী হিসেবে।-[সূরা নাহল,আয়াত-৮৯]

ইমাম শাতেবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ এই শরিয়তকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যার মাঝে মানুষের ইবাদত ও দায়িত্ব পালন এবং জীবনপরিচালনার প্রয়োজনীয় সমস্ত দিকনির্দেশনার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দীনের পরিপূর্ণতা লাভের স্বীকৃতি নিয়েই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।-[সূরা মায়িদাহ,আয়াত-৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে এই দীন পূর্ণাঙ্গ নয়; পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, সে আল্লাহর এই আয়াত অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হবে। দীন পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, মানব- জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে শরিয়ত মৌলিকভাবে কোনো না কোনো নির্দেশনা দিয়েছে। অর্থাৎ একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন এসব মূলনীতি থেকে শাখাগত বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব মুজতাহিদদের উপর ন্যস্ত থাকবে। *(৫) মনে রাখতে হবে শরিয়তের মূলনীতি মেনে মুজতাহিদগণ নব উদ্ভাবিত যেসব বিষয়ের মাসআলা বের করেন, যদিও তা বাহ্যত মানবীয় সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই 'বিমা আনযালাল্লাহ' (আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন) এর অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা প্রকাশ পায় একজন মুত্তাকি মুজতাহিদের গবেষণার মাধ্যমে। কারণ, এখানে মূলনীতি মানা হচ্ছে শরিয়তকে।

-

[(৫)-আলই' তিসাম-৪৯১; ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-১/৩৩২-৩৩৪; আলমুওয়াফাকাত]

-

আমাদের শরিয়ত পরিপূর্ণ। মানব-জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নেই, যার ব্যাপারে শরিয়ত বৈধতা বা অবৈধতার আদেশ-নিষেধ জারি করেনি। এখন হতে পারে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে অথবা কোনো মূলনীতির আওতায় এর আলোচনা রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন কোনো নতুন বিষয় সামনে আসেনি, যা ইসলামের কোনো মূলনীতির আওতায় পড়েনি কিংবা তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম প্রয়োগ করা যায়নি। শরিয়তের নস নির্দিষ্ট; কিন্তু সেগুলো ব্যাপক। কিয়ামত পর্যন্ত যত বিষয় আসবে ও ঘটবে, শরিয়ত সবকিছুর জন্য যথেষ্ট। এই শরিয়তে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির যেকোনো সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

পরিশিষ্ট -

দীর্ঘ আলোচনায় এটুকু অন্তত আমাদের বুঝে আসছে যে,সেকুলারিজম মূলত এমন একটি ধারণা, যা জীবনের সব ক্ষেত্রে ধর্মীয় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে মানববুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর উৎপত্তি ও বিকাশ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ,এটি পাশ্চাত্যের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় সংকটের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা একটি চিন্তাধারা। এই দর্শন মুসলিম সমাজের আকীদা, জীবনদৃষ্টি ও সভ্যতাগত মূল্যবোধের সাথে মূলগতভাবে অসঙ্গত। ফলে সেকুলারিজম যখন মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করে, তখন তা শুধু দ্বীনকে ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করেই থেমে থাকে না; বরং দীর্ঘমেয়াদে পরিচয় সংকট, আকীদাগত দুর্বলতা, নৈতিক অবক্ষয় এবং ইসলামের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা তৈরি করে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত জীবনব্যবস্থা-যেখানে আকীদা, ইবাদত, নৈতিকতা, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়।তাই ইসলাম ও সেকুলারিজমের সমন্বয় কখনোই সম্ভব নয়। কারণ একটির ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহর স্বীকৃতি, আরেকটির ভিত্তি হচ্ছে মানুষের স্বায়ত্তশাসনকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দ্বীনকে "শুধু ব্যক্তিগত ভক্তি"তে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার এই সেকুলার প্রবণতাকে চিহ্নিত করা এবং এর চিন্তাগত ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এজন্যে প্রয়োজন আকীদাগত দৃঢ়তা, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের পুনরুজ্জীবন, এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে দ্বীনের যথাযথ অবস্থান পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টা।

সেকুলারিজমের মতো মতবাদের সঙ্গে আপোষ কখনোই সম্ভব নয়।কারণ ঈমানের প্রশ্নে কখনো আপোষ চলে না। যেমন এক হৃদয়ে ঈমান ও কুফর একসাথে অবস্থান করতে পারে না, তেমনি তাওহীদ ও সেকুলারিজমও একই হৃদয়ে একত্র হতে পারে না। যে হৃদয় সত্যিকার ঈমান ধারণ করে, সেখানে সেকুলার ভাবধারার কোনো স্থান নেই; আর যে হৃদয় সেকুলারিজমকে গ্রহণ করে, তা ঈমানের পূর্ণ দাবির বাহক হতে পারে না।

মুসলিম সমাজের বাস্তবতায় দেখা যায়,যেদিন থেকে আমরা খিলাফাহ, ইমারাহ, শরিয়াহ চাওয়ার পরিবর্তে যেদিন থেকে সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র চাওয়া শুরু করেছি, সেদিন থেকেই এই সমাজে খিলাফাহ, ইমারাহ শব্দগুলো জঙ্গিবাদের সমার্থক হয়ে গেছে। এখন কেউ গণতান্ত্রিক সেক্যুলার-ব্যবস্থা বাতিল মনে করলে এবং তার পতন কামনা করলে তাকে জঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়; অথচ ঈমানের দাবিই হলো ইসলামি-ব্যবস্থা ছাড়া সমস্ত ব্যবস্থা

বাতিল মনে করা। সেগুলোর বিলুপ্তি কামনা করে ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

পরিশেষে বলা যায়,সেকুলারিজম মুসলিম সমাজের জন্য শুধু একটি ভিন্ন মতবাদ নয়; বরং একটি চিন্তাগত চ্যালেঞ্জ, যা দ্বীনকে ব্যক্তিগত পরিসরে আটকে রেখে ইসলামকে তার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে দরকার হয় জ্ঞান, সচেতনতা, আকীদাগত দৃঢ়তা এবং ইসলামের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রচেষ্টা। মুসলিম সমাজ যদি পুনরায় কুরআন–সুন্নাহর সার্বিক পথনির্দেশনা অনুসরণে প্রত্যাবর্তন করে, তবে সেকুলার চিন্তার এই ধারা কখনোই মুসলমানদের পরিচয়, বিশ্বাস ও সভ্যতাকে পরাভূত করতে পারবে না ইন শা আল্লাহ।

আলোচনার যা কিছু সঠিক ও কল্যাণকর ছিলো তার সবটাই আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে।আর যা কিছু ভূল ও অকল্যাণকর তা আমার ও শাইতানের পক্ষ থেকে।

রেফারেন্স:

যে সকল বই ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া হয়েছে-

১।চিন্তাপরাধ-আসিফ আদনান

২।হিউম্যান বিয়িং-ইফতেখার সিফাত

৩।hadithbd.net

৪।darulilm.org

৫।muslimbangla.com

৬।alkawsar.com